আইনের পরিসর

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মীদের জন্য সুতানুটি সখ্য'র একটি প্রয়াস

সুতানুটির সখ্য

(বন্ধুত্ব, সর্বোত্তম মানবিক বন্ধন)

সম্পাদনায় মধুপূর্ণা ঘোষ

SUTANUTIR SAKHYA

সুতানুটির সখ্য

আইনি সচেতনতা ও সহায়তা কেন্দ্র

১/৪বি, পাইকপাড়া রো (তৃতীয়), কলকাতা ৭০০০৩৭

e-mail : sutanutirsakhya@gmail.com

: সহযোগিতায় :

আইন ও ন্যায়বিচার মন্ত্রক, লেজিসলেটিভ ডিপার্টমেন্ট, অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজেস উইং,

শাস্ত্রী ভবন, এ উইং, ৮ম তল, রুম নং–৭৪২, নিউ দিল্লী–১১০০০১

Aainer Parisar
Published by Sutanutir Sakhya
1/48, Paikpara Row (3rd), Kolkata-70000037

স্বত্ব : সুতানুটির সখ্য

প্রকাশ : নভেম্বর ২০০৯
পরবর্তী মুদ্রণ : এপ্রিল ২০১৫
তৃতীয় মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর ২০১৮

সুতানুটির সখ্য-র পক্ষে মধুপূর্ণা ঘোষ, ১/৪বি, পাইকপাড়া রো (তৃতীয়),
কলকাতা ৭০০০৩৭, দূরভাষ : (০৩৩) ৬৫৩৩ ৩৭৮৯,
চলভাষ : ৯৮৩০৭ ৫৩৬৭৮ কর্তৃক প্রকাশিত ও
লেজার পয়েন্ট, ২ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৬
চলভাষ : ৯২৩১৭ ৮৭৭৭৯ থেকে মুদ্রিত।

সমস্ত তৃণমূল স্তরের
সমাজকর্মীদের

আইনের পরিসর

২০০২ সাল, সুতানুটির সখ্য'র আত্মপ্রকাশ।

'সুতানুটির সখ্য' নামটির মধ্যে একদিকে যেমন ঐতিহাসিক কোলকাতাকে ধরে রাখা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি সখ্য কথাটির মধ্যেও স্বচ্ছ বন্ধুত্বের আভাস রয়েছে। আসলে আমরা বিশ্বাস করি বন্ধুত্বই আসল মাধ্যম, যা দিয়ে এক নতুন সমাজের স্বপ্ন দেখা যায়। আমাদের স্বপ্ন ধনী-দরিদ্র ভেদাভেদহীন, লিঙ্গবৈষম্যহীন এবং অত্যাচার মুক্ত সমাজ। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় তথা আইনি ব্যবস্থায় নারী এবং শিশুদের বিশেষভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও আমাদের সমাজে নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ক্রমবর্ধমান।

নারীর অধিকার সম্বন্ধে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে সচেতন করা সুতানুটির সখ্য'র লক্ষ্য।

সুতানুটির সখ্য নির্যাতিতা বা ক্ষতিগ্রস্থ মহিলাদের আইনি পরামর্শ দেয় এবং অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান যারা লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য নিয়ে কাজ করছেন তাদের সঙ্গে মিলিতভাবে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে।

দীর্ঘকাল ধরে আমরা সমাজকর্মীদের প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালনা করছি। আমাদের আশা 'আইনের পরিসর' পুস্তিকাটি সমাজকর্মীদের কাজে সাহায্য করবে। এই পুস্তিকা নির্মাণে তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন ডাঃ সুজন দাশগুপ্ত মহাশয়। তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

এই পুস্তিকাটি উৎসর্গ করছি তৃণমূল স্তরের সমস্ত সমাজকর্মীকে যাঁরা গ্রামে গঞ্জে নারীর অধিকার রক্ষার লড়াই লড়ছেন। আমাদের এগিয়ে চলার প্রেরণা তাঁরাই।

সূচিপত্র

- হিন্দু বিবাহ বিধি ৯
- মুসলিম বিবাহ আইন (শরিয়ত সম্পর্কে কিছু তথ্য) ১৩
- বিশেষ বিবাহ আইন, ১৯৫৬ ১৮
- বিবাহ বিচ্ছেদ আইন ১৯
- ধর্ষণের বিরুদ্ধে আইন ২০
- অনাবাসী পুরুষের সঙ্গে ভারতীয় মহিলাগণের বিবাহের ক্ষেত্রে যে বিষয়সমূহ জেনে রাখা জরুরী ২৪
- পণ নিবারণী আইন ২৭
- খোরপোষ বা ভরণপোষণ ২৯
- ফৌজদারী আইনের নারী নির্যাতন বিরোধী কয়েকটি ধারা ৩১
- ফৌজদারী আইনের কিছু সংশোধনী ৪০
- থানা পুলিশের ব্যাপারে নারীদের অধিকার ৪৩
- মহিলাদের সম্পত্তি সংক্রান্ত আইন ৪৪
- পারিবারিক নির্যাতন থেকে নারীদের সুরক্ষা আইন, ২০০৫ ৪৭
- সন্তানের হেফাজত সংক্রান্ত আইন ৪৯
- কর্মক্ষেত্রে নারীর যৌন হেনস্থা (নিবারণ, প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন) ৫২
- যৌন অপরাধ থেকে শিশুদের সুরক্ষা আইন, ২০১২ ৫৪
- হিন্দু দত্তক আইন (১৯৫৬) সম্পর্কিত কিছু তথ্য ৫৮
- পারিবারিক আদালত আইন ১৯৮৪ ৬১
- পিতা মাতা ও বয়স্ক নাগরিকগণের ভরণপোষণ এবং কল্যাণমূলক আইন, ২০০৭ ৬২
- লোক আদালত কি ও কেন? ৬৬
- মহিলা কমিশন ৬৮

হিন্দু বিবাহ বিধি, ১৯৫৫

এই আইন জম্মু ও কাশ্মীর ছাড়া ভারতের অন্য সব জায়গাতেই প্রযোজ্য। কোনও হিন্দু যদি এই আইনের আওতায় পড়ে এমন কোনও স্থানে বসবাস করেন—তাহলে তিনি বাইরে থেকে এলেও এই আইন তাঁর প্রতি প্রযোজ্য হবে। অহিন্দু অর্থাৎ খৃষ্টান, মুসলমান, ইহুদী, পার্শীদের প্রতি এই আইন প্রযোজ্য নয়। হিন্দু ও অহিন্দুর মধ্যে বিবাহ একমাত্র সম্ভবপর ''সিভিল ম্যারেজ''-এর সাহায্যে। ১৯৫৪ সালের স্পেশ্যাল ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুযায়ী প্রদেশ সরকারের নিয়োজিত ম্যারেজ রেজিস্ট্রাররা এই বিবাহ দিতে পারেন।

হিন্দু বিবাহ বিধিতে সামাজিক প্রথা ও নিয়ম অনুযায়ী হিন্দু বিবাহ সম্পন্ন হলে তাকে বৈধ হিসাবে গণ্য করা হয় এবং সপ্তপদী যেসব বিবাহের একটি অঙ্গ, অগ্নিসাক্ষী করে সপ্তপদী হয়ে যাবার পরেই বিবাহ সম্পূর্ণ হয়েছে বলে ধরা হয়। হিন্দু আইনে কোথাও বলা হয়নি যে, উভয়পক্ষের সম্মতি না থাকলে বিবাহ অসিদ্ধ হবে। কিন্তু যদি কোনও পক্ষের সম্মতি অসৎ উপায়ে বা জোর করে নেওয়া হয়—তাহলে সেই বিবাহ অবৈধ ঘোষিত হতে পারে। হিন্দু বিবাহ আইনের কতগুলি প্রয়োজনীয় তথ্য।

বৈধ বিবাহের শর্ত :

★ হিন্দু হতে হবে।

★ ন্যূনতম বয়স : পাত্রের ক্ষেত্রে ২১ ও পাত্রীর ক্ষেত্রে ১৮ বছর হতে হবে (এর থেকে কম বয়সে বিবাহ করা দণ্ডনীয় অপরাধ, যদিও তার জন্য বিবাহটি অবৈধ নাও হতে পারে)।

★ বিবাহকালে পাত্রীর অন্য স্বামী বা পাত্রের অন্য স্ত্রী জীবিত থাকলে চলবে না।

★ পাত্র ও পাত্রী পরস্পরের নিকট আত্মীয় (যা আইনত নিষিদ্ধ) হবেন না। (বিভিন্ন লোকাচার অনুযায়ী এগুলি শিথিলযোগ্য। যেমন দক্ষিণ ভারতের অনেক জায়গায় মামা তাঁর ভাগ্নীকে বিবাহ করতে পারেন)।

★ উভয়ের কেউই সপিণ্ড হবেন না (কারোর সপিণ্ড সম্পর্ক বিচার করতে হলে প্রথমে দেখতে হবে সেই সেই ব্যক্তিকে প্রথম প্রজন্ম হিসেবে ধরে তার মায়ের দিক থেকে তিনটি প্রজন্ম (generation) আগে এবং বাবার দিক থেকে পাঁচটি প্রজন্ম আগে কারা ছিলেন। দুজনকে তখন সপিণ্ড বলা হবে যদি একজনের সপিণ্ড সম্পর্কের কেউ অন্যজনের সপিণ্ড সম্পর্কের হয় অথবা একজন অন্যজনের সপিণ্ড সম্পর্কের কেউ হয়।)

নিষিদ্ধ সম্পর্কগুলির বিবরণ :

★ আপন সন্তান।

★ পুত্র-বধূ, জামাতা, পিতার স্ত্রী, মাতার স্বামী।

★ আপন ভাই-বোন অথবা মামাতো, মাসতুতো, পিসতুতো, খুড়তুতো, জ্যাঠতুতো সবাই।

★ মেয়েদের মামা, কাকা ও জ্যাঠা। ছেলেদের মাসি ও পিসি।

হিন্দু বিবাহ বিধিতে অসিদ্ধ (void) এবং অসিদ্ধ-সম্ভব (voidable) বিবাহের কথা বলা হয়েছে। বিবাহ অসিদ্ধ হবে যদি প্রাক-বিবাহ বাধা সত্ত্বেও বিবাহ সংঘটিত হয়। এই বাধাগুলিকে আবার দুটো ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—

(ক) নিরঙ্কুশ বাধা : এই বাধা সত্ত্বেও কেউ বিবাহ করলে সেটি প্রথম থেকেই অবৈধ। যে কোনও পক্ষ আবেদন জানালে এটি অসিদ্ধ বলে জারি করা হবে।

(খ) আপেক্ষিক বাধা : এক্ষেত্রে বিবাহ অসিদ্ধ হলে ঘোষিত হতে পারে যদি কোনও পক্ষ তার জন্য আবেদন করে।

নিরঙ্কুশ বাধাগুলি হল :

★ বিবাহকালে পাত্রের অন্য স্ত্রী বা পাত্রীর অন্য স্বামী জীবিত থাকলে চলবে না।

★ পাত্র-পাত্রী সপিণ্ড হবে না।

★ পাত্র-পাত্রী সম্পর্ক নিষিদ্ধ সম্পর্কের মধ্যে পড়বে না।

★ এছাড়া অন্য কারণে বিবাহ অসিদ্ধ হতে পারে। যেমন— বিবাহ-অনুষ্ঠানের আবশ্যকীয় অংশগুলি পালন না করা।

অসিদ্ধ (void) বিবাহের সঙ্গে অসিদ্ধ-সম্ভব (voidable) বিবাহের তফাৎ হল অসিদ্ধ-সম্ভব বিবাহ বৈধ বলে ধরা হবে যদি না কোনও এক পক্ষ এটি অসিদ্ধ ঘোষণা করার জন্য আবেদন জানায় এবং সেই আবেদন গৃহীত হয়ে বিবাহ বাতিল করা হয়। সেক্ষেত্রে বিবাহের দিন থেকে এই বিবাহ অসিদ্ধ বলে ধরা হবে। অসিদ্ধ-সম্ভব বিবাহের মূলে চারটি কারণ থাকতে পারে :

★ স্বামী পুরুষত্বহীন হয়।

★ বিবাহের সময়ে কোন পক্ষ পাগল বা জড়বুদ্ধিসম্পন্ন হয়।

★ বিবাহে সম্মতি আদায় করেছে শঠতার আশ্রয় নিয়ে বা জোর করে এক্ষেত্রে ১. শঠতা ধরা পড়ার বা বল প্রয়োগের (যা শারীরিক মানসিক দুই হতে পারে) এক বছরের মধ্যে আবেদন জানাতে হবে এবং ২. বলপ্রয়োগের বা শঠতা আবিষ্কৃত হবার পর আবেদনকারী স্বেচ্ছায় অন্যপক্ষের সঙ্গে সহবাসে লিপ্ত হননি।

★ বিবাহের পূর্বে পাত্রী যদি অন্য পুরুষের দ্বারা গর্ভবতী হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে (১) বিবাহের সময়ে পাত্রীকে গর্ভবতী থাকতে হবে (২) গর্ভধারণ ঘটেছে স্বামী ছাড়া অন্য কোনও পুরুষের দ্বারা (৩) আবেদনকারী বিবাহের সময়ে এই গর্ভধারণের কথা জানতেন না (৪) স্ত্রী গর্ভবতী জানার পর স্বামী স্বেচ্ছায় স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হননি (৫) গর্ভবতী জানতে পারার এক বছরের মধ্যে স্বামীকে আবেদন করতে হবে।

হিন্দু বিবাহ বিধিতে বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য আবেদন করা চলতে পারে এবং উপযুক্ত কারণ দেখাতে পারলে আদালত তা মঞ্জুর করতে পারে। কিন্তু বিবাহ হবার পর থেকে এক বছরের মধ্যে এই আবেদন করা চলবে না।

নিম্নলিখিত কারণগুলি উপযুক্ত কারণ হিসেবে গণ্য করা হবে :

★ স্বামী বা স্ত্রী ব্যভিচারে লিপ্ত হলে।

★ ধর্মান্তর গ্রহণ করে আর হিন্দু না থাকলে।

★ আবেদনের প্রাক্‌কালীন তিন বছর ধরে স্বামী বা স্ত্রী কেউ যদি মস্তিষ্ক বিকৃতিতে বা আরোগ্যের অতীত কুষ্ঠ ব্যাধিতে, কিংবা সংক্রামক যৌনব্যাধিতে ভুগলে।

★ স্বামী বা স্ত্রী সংসার ত্যাগ করলে বা কোনও ধর্ম-সম্প্রদায়ে যোগ দিলে।

★ স্বামী বা স্ত্রীর কেউ সাত বছর নিরুদ্দিষ্ট থাকলে।

★ আদালত কর্তৃক আলাদা হয়ে থাকার হুকুমনামার (জুডিশিয়াল সেপারেশন) পর উভয়পক্ষ আর স্বামী-স্ত্রী রূপে সহবাস না করলে।

★ আদালত দাম্পত্য-জীবন পুনরায় প্রতিষ্ঠার (রেস্টিট্যুশন অফ কনজুগাল রাইটস) হুকুম দেওয়া সত্ত্বেও, হুকুম অমান্য করে দুই বছর আলাদা হয়ে বাস করলে।

★ স্বামী যৌন-অত্যাচার করলে।

★ স্ত্রী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও অন্য কাউকে বিবাহ করলে। যদিও সেই দ্বিতীয় বিবাহ অসিদ্ধ, কিন্তু এটিও বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদনের একটি উপযুক্ত কারণ।

★ দুজনের সম্মিলিত ইচ্ছা।

সূত্র : অবসর নেট

মুসলিম বিবাহ আইন সম্পর্কে কিছু তথ্য

ভারতবর্ষে মুসলিম আইন সৃষ্টি হয়েছে মূলত কোরানের নির্দেশ থেকে। তবে নির্দেশগুলি সংশোধিত হয়েছে বিধানসভা ও লোকসভায় গৃহীত বিল এবং কোর্টের বিভিন্ন রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে।

মুসলিম আইন (শরিয়ত) অনুসারে বিবাহ বা নিকা হল পরস্পরের উপভোগের জন্য এবং বৈধ সন্তান উৎপাদনের জন্য স্বেচ্ছায় চুক্তিবদ্ধ হওয়া। **এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল:**

- মুসলিম বিবাহ হতে গেলে এক পক্ষ থেকে বিবাহের প্রস্তাব (ইজাব) আসতে হবে এবং অন্য পক্ষকে তাতে সম্মতি (কবুল) জানাতে হবে। সম্মতি ছাড়া বিবাহ বৈধ হবে না এবং এই সম্মতি কোনও শর্ত-সাপেক্ষ হওয়া চলবে না। উপরন্তু এই সম্মতি আদায় করার জন্য কোনও রকম চাপ সৃষ্টি, মিথ্যার প্রশ্রয় নেওয়া বা কোনোরূপ প্রভাব খাটানো চলবে না। একই বৈঠকে প্রস্তাব ও সম্মতিদান সম্পন্ন করতে হবে এবং এগুলি করতে হবে সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে। সাক্ষী থাকবে দুই জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুই জন নারী (সুন্নি আইন অনুসারে)। নারী সাক্ষীদের ক্ষেত্রে সাক্ষীদের হতে হবে প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থমনা ও মুসলিম। শিয়া আইনে বিবাহের সময় সাক্ষীর প্রয়োজনীয়তা নেই।
- মুসলিম বিবাহ আইনে নাবালক ও অসুস্থমনা ব্যক্তিদের বিবাহ হওয়া সম্ভব, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে অভিভাবক ও কোনও প্রতিনিধি কর্তৃক এই বিবাহ-চুক্তি সম্পাদিত হবে। নাবালকরা প্রাপ্তবয়স্ক হবার পর চাইলে এই চুক্তি বাতিল করতে পারবে।
- এই বিবাহের অধিকার ও দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে বিবাহের আগে, বিবাহের সময়ে অথবা বিবাহের পরে উভয়পক্ষের মধ্যে যে বোঝাপড়া (শর্ত) হবে, তা যদি মুসলিম আইন বা সাধারণ নীতির পরিপন্থী না হয়, তাহলে সেই শর্ত বাধ্যতামূলক হবে।

সূত্র : অবসর নেট

- মুসলিম বিবাহ আইনে দেনমোহরের ব্যবস্থা আছে। দেনমোহরে একটি অর্থের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয়, যেই পরিমাণ অর্থ স্ত্রীকে দিতে স্বামী বাধ্য থাকবে। বিবাহের সময়ে বা পূর্বে এই দেনমোহর স্থির হয়। অবশ্য পরেও করা যেতে পারে। দেনমোহরকে বিবাহ-চুক্তির মূল্য বা শর্ত বলা চলে না (মুসলিম বিবাহে কোনও শর্ত থাকে না)। লাহোর ও এলাহাবাদ হাইকোর্ট দেনমোহরকে স্ত্রীর মর্যাদাস্বরূপ বলে বিচার করেছেন—অর্থাৎ এটি হল আইনগত স্ত্রীর প্রাপ্য মর্যাদা। বিবাহ-চুক্তিতে যদি লেখাও থাকে দেনমোহর দিতে হবে না—সেক্ষেত্রেও দেনমোহর স্ত্রীর প্রাপ্য।
- মুসলিম বিবাহ আইনে নিকট আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। সেই আত্মীয়তা রক্ত-সম্পর্কিত হতে পারে (যেমন পুরুষের ক্ষেত্রে তার মাতা, মাতামহী, কন্যা, পৌত্রী ইত্যাদি), কিংবা অন্য কোন নিকট আত্মীয় হতে পারে (যেমন—পুরুষের ক্ষেত্রে শাশুড়ি, স্ত্রী পূর্ববিবাহজাত কন্যা, বিমাতা ইত্যাদি)।
- এই আইন অনুসারে পুরুষরা একসঙ্গে চারটি বিবাহ করতে পারে। কিন্তু নারীদের পক্ষে একই সঙ্গে একাধিক স্বামী থাকা নিষিদ্ধ।
- মুসলিম বিবাহ আইনে অনেক অবৈধ বিবাহ বৈধ হয়ে যায় যখন অবৈধতার কারণ লুপ্ত হয়। যেমন—চারটি স্ত্রী বর্তমান থাকলেও কেউ যদি আবার বিবাহ করে, তাহলে সেই বিবাহ অবৈধ। কিন্তু সে যদি একজন স্ত্রীকে তালাক দেয় (বা পরিত্যাগ করে), তাহলে তার অবৈধ বিবাহটি বৈধ হয়ে যায়। কোনও নারীর ইদ্দতের সময়কালে তাকে বিবাহ করলে সেই বিবাহ অবৈধ, আবার ইদ্দতের সময় পার হয়ে গেলেই সেটি বৈধ বলে গণ্য হবে। (ইদ্দত : স্বামীর মৃত্যুর পর বা বিবাহ-বিচ্ছেদের পর মুসলিম নারী যে সময়ের জন্য [মোটামুটিভাবে তিনমাস বা তার অধিক] একা থাকে)।
- সুন্নি পুরুষ যদি কোনও মুসলিম নারী বা কিতাবিয়াকে (অর্থাৎ, যে ধর্মে ঈশ্বর-প্রদত্ত বাণী পুস্তকাকারে [বাইবেল, কোরান ইত্যাদি] আছে—সেই ধর্মাবলম্বীকে) বিবাহ করে—তাহলে সুন্নি আইন

অনুসারে সেটি বৈধ হবে। কিন্তু যে ধর্মে পৌত্তলিকতা আছে (যেমন হিন্দু ধর্ম)—সেই ধর্মাবলম্বী নারীকে বিবাহ করতে পারে না। করলে, সেটিকে নিয়ম-বহির্ভূত বা অনিয়মিত বলে গণ্য করা হবে। শিয়া আইনে এটি শুধু অনিয়মিত নয়, এটি হবে অবৈধ। সুন্নি ও শিয়া—কোন আইনেই মুসলিম নারী কোনও অমুসলিম পুরুষকে (সে কিতাবিয়া হলেও) বৈধভাবে বিবাহ করতে পারে না। সুন্নি আইন অনুসারে সেটি হবে নিয়ম—বহির্ভুত বিবাহ। শিয়া আইন অনুসারে সেটি হবে অবৈধ।

- যদিও কোরান ও হাদিসে এ-বিষয়ে সমর্থন নেই, তবুও অন্য চুক্তির মত বিবাহ-চুক্তিও যাতে ভঙ্গ করা যায়—তার ব্যবস্থা ভারতবর্ষের মুসলিম আইনে রয়েছে। The Dissolution of Muslim Marriage Act, 1939 অনুসারে মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইনে নারীর পক্ষে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য আদালতে যাবার কয়েকটি শর্ত আছে। যেমন—

১. চার বছর ধরে স্বামী নিখোঁজ;

২. দুই বছর ধরে স্বামী তাকে অবহেলা করছে বা ভরণপোষণ দেয়নি;

৩. স্বামী সাত বছর বা তার অধিক কালের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত;

৪. তিনবছর ধরে কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া দাম্পত্য কর্তব্য করেনি;

৫. দুই বছর ধরে স্বামীর মাথা খারাপ কিংবা কুষ্ঠরোগগ্রস্থ বা সংক্রামক যৌনব্যাধিতে আক্রান্ত;

৬. বিবাহের সময় স্বামী অক্ষম ছিল এবং এখনও আছে;

৭. ১৫ বছর বয়স হবার আগে যে বিবাহ হয়েছিল, ১৮ বছর বয়সের আগেই সে বিবাহকে স্বামী অস্বীকার করেছে এবং দাম্পত্য সম্পর্ক ঘটেনি;

৮. স্বামী নিষ্ঠুর আচরণ করেছে, যেমন—তাকে প্রহার করছে বা মানসিকভাবে পীড়ন করছে, অসৎ রমণীর সঙ্গে সংসর্গ করছে,

স্ত্রীকে জোর করে অসামাজিক অবৈধ জীবনযাপন করতে বাধ্য করছে, ধর্মীয় আচরণে হস্তক্ষেপ করছে, স্ত্রীর আইনসঙ্গত অধিকারে বাধা দিচ্ছে, কোরানের অনুশাসন অনুযায়ী সকল স্ত্রীদের সঙ্গে সম-আচরণ করছে না ইত্যাদি।

পুরুষদের ক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদের একক ইচ্ছার অর্থাৎ তালাক দেওয়ার আইন আছে। তবে একসঙ্গে তিন তালাক উচ্চারণ করে তালাক দেওয়া আদালতের রায়ে নিষিদ্ধ। তবে তালাক দেওয়া স্ত্রীকে সেই পুরুষ আবার বিবাহ করতে পারবে না। তালাক- প্রাপ্তা সেই মুসলিম নারী যদি অন্য কোনও পুরুষকে বিবাহ করে এবং সেই বিবাহ ভেঙ্গে যায়, তখনই আবার তাকে বিবাহ করা যাবে।

শরিয়ত আইনে স্ত্রীকে বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার দেওয়া হয়েছে দুটি ক্ষেত্রে। এক হল জিহার, অর্থাৎ স্বামী যদি নিষিদ্ধ সম্পর্কের কোনও স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হয় এবং তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে রাজি না হয়। সেক্ষেত্রে স্ত্রী আবেদন করলে আদালত বিবাহবিচ্ছেদের আদেশ দেবে।

স্ত্রী স্বামীকে মুক্তিমূল্য (স্বামীর শর্ত অনুযায়ী খুলা) দিয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদ করিয়ে নিতে পারে। স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের সম্মতিতেই বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়, একে বলা হয় মুবারাত।

মহম্মদ আহমেদ খান ও শাহবানো বেগমের মামলায় সুপ্রীম কোর্ট রায় দিয়েছিল যে, বিবাহ বিচ্ছেদের পরে যদি মুসলিম নারী নিজের ভরণপোষণ চালাতে পারে, তাহলে পুরুষের দায়িত্ব ইদ্দতের পরেই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু সেই নারী যদি নিজের ভরণপোষণ চালাতে সক্ষম না হয়, তাহলে ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোডের ১২৫ ধারা অনুযায়ী তার ভরণপোষণের দায়িত্ব থাকবে প্রাক্তন স্বামীর। এরপর মুসলিম স্বামীদের প্রাক্তন স্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে নানান বাদ-প্রতিবাদ শুরু হয়। মুসলিম নারী (বিবাহবিচ্ছেদের পর অধিকার রক্ষা আইন), ১৯৮৬ পাশ করানো হয় সুপ্রীম কোর্টের এই রায়ের প্রযোজ্যতা সীমিত করার জন্য। বর্তমানে মুসলিম মহিলারা ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোডের ১২৫ ধারা অনুযায়ী খোরপোসের মামলা করতে পারেন।

সূত্র : অবসর নেট

প্রসঙ্গতঃ কলকাতা হাইকোর্ট ২০০১ সালে রায় দিয়েছে যে, মুসলিম মেয়েদের ১২৫ ধারায় আবেদনের পথ খোলাই রয়েছে, কারণ ১২৫ ধারা একটি ধর্ম নিরপেক্ষ আইন। তাঁরা ইচ্ছে করলে এই আইনের সুযোগ নিতে পারবেন। ১২৫ ধারা বেশ কঠোর আইন। এই ধারায় টাকা দেবার আদেশ দেওয়া হলে, সেই টাকা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে না দিলে, ম্যাজিস্ট্রেট ওয়ারেণ্ট জারি করতে পারবে। সময়মত টাকা না দিলে একমাসের বা যতদিন টাকা না দেওয়া হচ্ছে ততদিন কারাদণ্ডের আদেশ হতে পারে।

বিশেষ বিবাহ আইন, ১৯৫৪

ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী নর নারী বসবাস করেন। তারা যদি অন্য ধর্মের কাউকে বিবাহ করতে চান তাহলে সেই বিবাহ বিশেষ আইন অনুযায়ী নিজ নিজ ধর্ম অক্ষুন্ন রেখে করতে পারেন।

অর্থাৎ এটি একটি ধর্মনিরপেক্ষ বিবাহ আইন।

এই আইন মেনে যারা বিবাহ করবেন তাঁদের বিবাহ বিচ্ছেদ, ভরণপোষণ, আলাদা বসবাস নিয়ন্ত্রিত হবে এই আইনের দ্বারা, কোন ব্যক্তিগত আইন বা ধর্মীয় আইনের দ্বারা নয়।

এই আইন অনুসারে বৈধ বিবাহের শর্তাবলী

★ পাত্র বা পাত্রী কোন পক্ষের স্বামী বা স্ত্রী বর্তমান থাকতে পারবে না।

★ পাত্র বা পাত্রী কেউ উন্মাদ বা জড়বুদ্ধি নয়।

★ পুরুষের বয়স ন্যূনতম ২১ বছর ও মহিলার বয়স বিবাহের সময় ন্যূনতম ১৮ বছর হতে হবে।

★ দুজনে নিষিদ্ধ সম্পর্কের মধ্যে পড়েন না।

বিবাহ পদ্ধতি

★ প্রতিটি অঞ্চলে সরকার নিযুক্ত বিবাহ আধিকারিক আছেন। তাঁর অফিসে বিবাহে একমাস আগে নোটিস দিতে হবে।

★ নোটিসটি একমাস তাঁর অফিসে টাঙানো থাকবে। কারো কোন আপত্তি থাকলে তিনি জানাতে পারেন।

★ একমাস বাদে বিবাহ আধিকারিকের অফিসে বা নিকটবর্তী কোন স্থানে হতে পারে।

★ এই বিয়েতে কোন ধর্মীয় আচার পালন করার প্রয়োজন হয় না।

★ ম্যারেজ সার্টিফিকেট এই বিয়ের প্রমাণ। তাই এই সার্টিফিকেট যত্ন করে সংরক্ষণ করা আবশ্যক।

★ এই আইনে স্বামী বা স্ত্রী দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারেন বিবাহবিচ্ছেদের দ্বারা।

বিবাহ বিচ্ছেদ (২৭ নং ধারা)

নিম্নলিখিত কারণে জেলা আদালতে পরস্পরের বিরুদ্ধে আবেদন করা যাবে

★ স্বামী বা স্ত্রী অন্য নারী বা পুরুষের সঙ্গে সহবাস করেন।

★ স্বামী বা স্ত্রী যথেষ্ট কারণ ছাড়াই একে অপরকে পরিত্যাগ করে চলে গেছেন।

★ যদি স্বামী বা স্ত্রীর ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী সাত বছরের কারাবাস হয়।

★ যদি স্বামী বা স্ত্রী বিবাহের পরে একে অপরের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করে।

★ স্বামী বা স্ত্রী যদি পাগল হন বা সংক্রামক ব্যধিতে আক্রান্ত হন অথবা কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হন এবং যদি সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে।

★ স্বামী বা স্ত্রী যদি সাত বছরের বেশি সময় ধরে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ না রাখেন।

★ স্বামী বা স্ত্রী যদি আদালত কর্তৃক নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও দুই বছর বা তার অধিক সময় ধরে দাম্পত্য সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার আদেশ অমান্য করেন।

পারস্পরিক সম্মতিতে বিবাহবিচ্ছেদ সম্ভব। এই ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই জেলা আদালতে আবেদন জানাবেন যে তাঁরা একসঙ্গে থাকতে পারছেন না এবং এক বৎসর যাবৎ বা তার বেশি সময় ধরে আলাদা বসবাস করছেন। বিবাহবিচ্ছেদের জন্য পারস্পরিক সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। (বিশেষ বিবাহ আইনের ২৮ নং ধারা)

আইনের পদ্ধতিসমূহ ও মামলার স্থান নির্বাচন ঃ

★ এই আইনের সব মামলার বিচার দেওয়ানী কার্যবিধি অনুযায়ী দেওয়ানী আদালতে হবে।

★ বিবাহ বিচ্ছেদ, বিবাহ বাতিল করা, দাম্পত্য সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করা, আলাদা বসবাস করা, ভরণপোষণ ইত্যাদির বিধান এই আইনে আছে।

আবেদন করতে হবে যে অঞ্চলে বা যে থানার আওতাধীন অঞ্চলে তারা বসবাস করেন সেই অঞ্চলের জন্য যে আদালত নির্দিষ্ট সেই আদালতে।

ধর্ষণের বিরুদ্ধে আইন

বর্তমানে আমাদের সমাজে নারীর প্রতি হিংসা ক্রমশ বাড়ছে। তারমধ্যে যে ঘটনাগুলো আমাদের সব থেকে বেশি বিচলিত করে তা হল ধর্ষণের মতো ঘৃণ্য অপরাধ। প্রতিদিন খবরের কাগজের পাতা খুলে দেখি দেশের কোনও না কোনও জায়গার মহিলারা ধর্ষিতা হচ্ছেন। এই অপরাধে আক্রান্ত হন যেসব মহিলা, তাঁরা অনেক সময় বুঝে উঠতে পারেন না, তাঁদের করণীয় কী। ফলে আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে দেরি হয়ে যায়, আর সে কারণে অপরাধী খানিকটা সুবিধে পেয়ে যায়। অনেকসময় কোনও শাস্তিই দেওয়া যায় না তাদের।

ফৌজদারি আইন অনুযায়ী ধর্ষণের সংজ্ঞা

ভারতীয় দণ্ডবিধি ৩৭৫ ধারা অনুসারে, কোনও পুরুষ যদি নিম্নলিখিত যে কোনও একটি অবস্থায় কোনও মহিলার সঙ্গে যৌনসঙ্গম করেন তবে তা ধর্ষণ হিসাবে গণ্য হবে—(১) মহিলার ইচ্ছার বিরুদ্ধে (২) মহিলার সম্মতি ছাড়া (৩) মহিলা বা তাঁর প্রিয়জনকে মৃত্যু বা আঘাতের ভয় দেখিয়ে তাঁর সম্মতি আদায় করে (৪) এমনভাবে মহিলার সম্মতি নেওয়া হয়েছে যখন মহিলা জানেন যে পুরুষটি তার বিবাহিত স্বামী কিন্তু পুরুষটি জানে যে সে মহিলার স্বামী নয় (৫) মহিলাটি মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন এমন অবস্থায় অথবা পুরুষটির বা অন্য কারও দেওয়া মাদক বা নেশার জিনিস গ্রহণ করে তিনি নেশাগ্রস্ত হয়ে সম্মতি দিয়েছেন যখন তিনি বুঝতে পারছেন না এই সম্মতি দেওয়ার পরিণতি বা ফলাফল কী হতে পারে (৬) ১৬ বছরের কম বয়সী নাবালিকার সম্মতি নিয়ে বা না নিয়ে (৭) ১৫ বছরের কম বয়সী স্ত্রীর সঙ্গে তার স্বামী ইচ্ছার বিরুদ্ধে যৌনসঙ্গম করলে তা ধর্ষণের অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।

যদি কোনও মহিলা আক্রান্ত হন তখন কী করণীয়

যে এলাকায় এই অপরাধ ঘটেছে সেই এলাকা যে থানার অঞ্চলভুক্ত সেখানে গিয়ে ওই মহিলাকে একটি এফ. আই. আর করতে হবে। মনে রাখতে হবে, ধর্ষণ একটি গুরুতর অপরাধ এবং পুলিশকে এক্ষেত্রে এফআইআর নিতেই হবে। কোনও অবস্থাতেই পুলিশ অভিযোগকারিণীকে অস্বীকার করতে পারে না।

যদি মহিলা অসুস্থ হয়ে পড়েন তাহলে প্রথমেই তাঁকে কোনও সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার চিকিৎসা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে সেই অঞ্চলের থানায় খবর পাঠাবেন। থানা থেকে তদন্তকারী অফিসার হাসপাতালে এসে প্রথমে এফআইআর নেবেন এবং তদন্ত শুরু করবেন।

আক্রান্ত মহিলার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ

ধর্ষণের ঘটনার পর যতক্ষণ ডাক্তারি পরীক্ষা না হচ্ছে ততক্ষণ তিনি স্নান করবেন না, গায়ে জল লাগাবেন না বা ঘটনার সময় যে জামাকাপড় পরেছিলেন তা কেচে ফেলবেন না। কারণ ধর্ষণের অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য এই জামাকাপড় সাহায্য করবে। তাঁর শরীরে রক্তের দাগ, অভিযুক্তের বীর্যের দাগ তাঁর জামাকাপড়ে থাকতে পারে। এগুলোও ধর্ষণের ঘটনার সাক্ষী হিসেবে কাজ করবে। এই জামাকাপড় পুলিশ নিজের হেফাজতে জমা নিয়ে নেয়।

ঘটনাটি গোপন না করে পুলিশকে জানানো এবং এফআইআর করা

এই অপরাধের ঘটনা ঘটলে নির্যাতিতা সাংঘাতিক মানসিক আঘাত পান। তাঁর স্বাভাবিকভাবে মনে হয়, ঘটনাটি যাতে কেউ না জানতে পারে। কারণ আমাদের সমাজে আক্রান্তকেই দোষী মনে করা হয়। ধর্ষকও ভয় দেখায়, ‘‘পুলিশকে জানানো হলে আরও ক্ষতি হবে’’। কিন্তু ভয় কাটিয়ে উঠে পুলিশকে না জানালে অপরাধীদের শাস্তি হবে না এবং উপরন্তু তারা মহিলাটির ওপর নানা ধরনের মানসিক অত্যাচার করবে বা একটানা অত্যাচার চালিয়ে যাবে।

থানায় গিয়ে সবসময় অফিসার ইন-চার্জের সঙ্গে দেখা করতে হবে। অনেক সময় থানায় অন্য অফিসার বা কনস্টেবলের সঙ্গে দেখা করে মেয়েরা তাদের পরামর্শ শুনে অভিযোগ না করে ফেরত আসেন। এটা হতে দেওয়া উচিত নয়।

ধর্ষণের শাস্তি

ধর্ষণ প্রমাণিত হলে ধর্ষণকারীর সাত বছর জেল ও জরিমানা হতে পারে। তবে নাবালিকা, গর্ভবতী ও গণধর্ষণের ক্ষেত্রে দশ বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে।

৩৭৬ ধারায় ধর্ষণের ফলে মহিলাটির মৃত্যু বা দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক ও মানসিকভাবে জড়তাপ্রাপ্তি ঘটলে এই অপরাধের শাস্তি নূন্যতম কুড়ি বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং তদূর্ধ্ব আজীবন কারাদণ্ড হতে পারে (যতদিন না অপরাধীর জীবনাবসান হচ্ছে)।

৩৭৬-বি নং ধারা

যদি কোনো সরকারি কর্মকর্তা তার কাজের ক্ষেত্রে নিজ পদ বা অবস্থানের সুযোগ নিয়ে তাঁর তত্ত্বাবধানে আছেন এমন কোনো নীচু স্তরের কর্মচারীকে প্ররোচিত করে বা প্রলুব্ধ করে বা লোভ দেখিয়ে প্রলুব্ধ করে তার সঙ্গে যৌন সঙ্গম করে তবে তা ধর্ষণের পর্যায়ের অপরাধ বলে গণ্য না হলেও শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে। অবশ্য ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ছাড়া বা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছাড়া এক্ষেত্রে গ্রেপ্তার করা যাবে না।

● **শাস্তি :** পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাবাস এবং তার সঙ্গে জরিমানাও হতে পারে।

এই অপরাধ জামিনযোগ্য, আপোশ অযোগ্য, দায়রা আদালতে এই অপরাধের বিচার হবে।

৩৭৬-সি নং ধারা

জেল, অপ্রাপ্তবয়স্ক হোম বা এই ধরনের আইনি স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান বা যেখানে নারী ও শিশুরা থাকে এমন কোনো প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে থাকা

সুপারিনটেন্ডেন্ট যদি তার পদ বা অবস্থানের সুযোগ নিয়ে জেল, হোম বা সে ধরনের প্রতিষ্ঠানের মহিলাদের প্ররোচিত করে বা লোভ দেখিয়ে প্রলুব্ধ করে তার সঙ্গে যৌনসঙ্গম করে তবে তা ধর্ষণের অপরাধ বলে গণ্য না হলেও শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে। গ্রেপ্তারি পরোয়ানা অথবা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ছাড়া এক্ষেত্রে গ্রেপ্তার করা যাবে না।

● **শাস্তি :** পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাবাস এবং তার সঙ্গে জরিমানাও হতে পারে।

এই অপরাধ জামিনযোগ্য, আপোশ অযোগ্য, দায়রা আদালতে এই অপরাধের বিচার হবে।

৩৭৬-ডি নং ধারা

কোনো হাসপাতালের পরিচালন কমিটির দায়িত্বে থাকা কোনো ব্যক্তি বা কোনো কর্মচারী তার পদের (অবস্থানের) সুযোগ নিয়ে ওই হাসপাতালের মধ্যে কোনো মহিলার সঙ্গে যৌনসঙ্গম করলে সে কাজ ধর্ষণের অপরাধ বলে গণ্য না হলেও শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে। গ্রেপ্তারি পরোয়ানা অথবা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত এক্ষেত্রে গ্রেপ্তার করা যাবে না।

● **শাস্তি :** পাঁচবছর কারাবাস এবং তার সঙ্গে জরিমানাও হতে পারে।

এই অপরাধ জামিনযোগ্য, আপোশ অযোগ্য, দায়রা আদালতে এই অপরাধের বিচার হবে।

আদালত কর্তৃক নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে যদি স্বামী বা স্ত্রী আলাদা থাকেন (Judicial Separation) সেক্ষেত্রে স্ত্রীর অমতে যদি স্বামী বলপূর্বক যৌনসঙ্গম করে তবে সেটা ধর্ষণ হিসাবে অপরাধের মধ্যে গণ্য হবে।

অনাবাসী পুরুষের সঙ্গে ভারতীয় মহিলার বিবাহের ক্ষেত্রে যে বিষয়সমূহ জেনে রাখা জরুরী

বিদেশে বিয়ে স্থির করার আগে পাত্রের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা একান্ত জরুরি। পাত্রীর অভিভাবকরা মেয়ের বিদেশে স্বচ্ছন্দ জীবনের সম্ভাবনায় নামমাত্র আলাপের পরই বিয়ে ঠিক করে ফেলেন। এর ফলে পরবর্তীকালে নানা সমস্যা হতে পারে।

ইদানীং ইন্টারনেটের নানা ম্যাট্রিমনিয়াল সাইটের মাধ্যমে বিদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ভারতীয় বা ভারতীয় বংশোদ্ভুত বিদেশি নাগরিক পুরুষদের বিয়ে হচ্ছে ভারতীয় মহিলাদের সঙ্গে। অনেকসময় বিদেশে বিয়ের পর ভারতীয় মহিলারা নানা ধরনের সমস্যায় পড়েন। সাধারণত এই বিয়েগুলিতে পাত্র খুব কম সময়ের জন্য আসেন। পাত্রীর অভিভাবকরা মেয়ের বিদেশে স্বচ্ছন্দ জীবনের সম্ভাবনায় নামমাত্র আলাপের পরই বিয়ে ঠিক করে ফেলেন। পাত্র বা তাঁর পরিবার বিষয়ে ঠিকভাবে খোঁজখবর নেওয়া হয় না। ফলে অনেকসময় বিয়ের পর বর তাঁর স্ত্রীকে রেখে ফিরে যান আর যোগাযোগ রাখেন না। খোঁজ করতে গিয়ে দেখা যায় ওই ঠিকানায় তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না। এও দেখা গেছে বিদেশ থেকে এক তরফা বিবাহ বিচ্ছেদের ডিক্রি নিয়ে স্ত্রীর কাছে পাঠানো হয়। অনেকসময় দেখা গিয়েছে মেয়েরা স্বামীর সঙ্গে বিদেশে গিয়েছেন। কিন্তু ওখানে গিয়ে পারিবারিক হিংসার শিকার হয়েছেন। বিদেশে নিজের আইনি অধিকার, স্থানীয় সাহায্যকারী সংস্থা সম্পর্কে তথ্য, সেই দেশের বিচার ব্যবস্থা বা পুলিশ প্রশাসন সম্বন্ধে না জানার ফলে মহিলারা অসহায় হয়ে পড়েন। এদিকে নিজের পরিবারও পাশে থাকে না। ফলে বিদেশে অত্যাচারিত হয়ে ভারতে ফিরতে হয়। এরপর তাঁদের হাতে বিদেশের কোর্টের

সূত্র : সানন্দা পত্রিকায় পূর্ব-প্রকাশিত

নোটিস এসে পৌঁছয়। কারণ তাঁর স্বামী সেখানে তাঁর বিরুদ্ধে বিচ্ছেদের মামলা করেছেন। মেয়েদের পক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই মামলা লড়ে নিজের অধিকার পাওয়া সম্ভব হয় না। কারণ তিনি ভারতে থেকে বিদেশে যাওয়ায় ভিসা করিয়ে সেখানে সময়মতো পৌঁছতে পারেন না। তাই বৈবাহিক সম্পত্তির অধিকার, সন্তানের হেফাজত, বিদেশে ক্ষেত্র বিশেষে থাকার অধিকার, সবই তিনি হারান। তাই বিদেশে বিবাহ স্থির করার আগে পাত্রের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা জরুরি। যেমন—

- তাঁর বৈবাহিক অবস্থান, অর্থাৎ তিনি অবিবাহিত, আইনত বিচ্ছিন্ন, বিপত্নীক বা বিচ্ছেদের মামলা চলছে, এর মধ্যে কোনটি।
- তিনি কোথায় চাকরি করেন, কোন পদে আছেন, বেতন, অফিসের ঠিকানা, কর্তৃপক্ষের নাম ও ঠিকানা।
- অভিবাসন (Immigration) সংক্রান্ত তথ্য, অর্থাৎ কোন ধরনের ভিসায় তিনি বিদেশে গেছেন, স্ত্রীকে সঙ্গে নেওয়ার অনুমতি তিনি পাবেন কি না।
- এছাড়া তাঁর পরিবার সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া, বিদেশে তাঁর সম্পত্তি এবং বাড়ির ঠিকানা সঠিক কি না, পাত্রের বিরুদ্ধে কোনও ফৌজদারি অপরাধের ইতিহাস আছে কি না জেনে নিন। এছাড়া বিয়ে হওয়ার আগে অবশ্যই পাসপোর্ট ও ভিসা, ভোটার বা অ্যালিয়েন রেজিস্ট্রেশন কার্ড, সোশ্যাল সিকিউরিটি নম্বর, বিগত তিন বছরের আয়কর সংক্রান্ত কাগজপত্র, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের কাগজপত্র দেখে নিন।

মনে রাখুন :

১. বিয়ের রেজিস্ট্রি অবশ্যই করতে হবে। বিয়ের ছবি এবং রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট সঙ্গে রাখুন।

২. পাত্রীর পরিবারের উচিত বিদেশ যাওয়ার পরে তাঁর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা এবং সর্বদা তাঁর খোঁজখবর নেওয়া।

৩. পাত্র দেশ ছেড়ে যাওয়ার আগে তাঁর বিয়ে সম্বন্ধে হলফনামা থাকা আবশ্যক।

সূত্র : সানন্দা পত্রিকায় পূর্ব-প্রকাশিত

৪. দেশ ছেড়ে যাওয়ার আগে পাত্রীর উচিত তাঁর সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রের কপি যেমন পাসপোর্ট, ভিসা, ম্যারেজ সার্টিফিকেট, সম্পত্তির কাগজপত্র ইত্যাদি বাবা মা বা অন্য কোনও বিশ্বস্ত ব্যক্তির কাছে রেখে যাওয়া।

৫. বিদেশে যাওয়ার সময় স্বামীর কর্মস্থল, বন্ধু এবং আত্মীয়স্বজন, অ্যাম্বুলেন্স, ভারতীয় দূতাবাস এবং হাই কমিশন ইত্যাদির প্রয়োজনীয় ফোন নম্বর নিজের কাছে রাখা খুবই প্রয়োজন।

৬. বিদেশ যাওয়ার আগে স্বাস্থ্য বিমা করিয়ে নেওয়া উচিত।

৭. বিদেশে যাওয়ার আগে মহিলাদের উচিত সেই দেশে তিনি কী কী আইনি অধিকার পাবেন, বিশেষত পারিবারিক হিংসার শিকার হলে বা কোনও নির্যাতনের বিরুদ্ধে কীভাবে এবং কোথায় যোগাযোগ করবেন সে ব্যাপারে বিশদে খোঁজ নিয়ে রাখা।

৮. বিদেশে নিজের বাড়ির কাছাকাছি একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা জরুরি যাতে অর্থাভাব না হয়।

মধুপূর্ণা ঘোষ
সমাজসেবী ও আইনজীবী

সূত্র : সানন্দা পত্রিকায় পূর্ব-প্রকাশিত

পণ নিবারণ আইন, ১৯৬১

(১৯৮৪ ও ১৯৮৬ সালে সংশোধিত)

এই আইন অনুসারে যে-কোনও ধরণের পণ চাওয়াই হল দণ্ডনীয় অপরাধ। শুধু তাই নয় পণ দেওয়াটাও অপরাধ হিসেবে গণ্য হতে পারে। পণ বা যৌতুক বলতে বোঝাচ্ছে ঃ বিবাহের কারণে বিবাহের আগে, বিবাহের সময় বা বিবাহের পরে যে কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান দলিল, নগদ অর্থ ইত্যাদি যা দেওয়া হচ্ছে। (* এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই উপহারগুলি যদি প্রথা অনুযায়ী হয় এবং যে দান করছে—তার আর্থিক সঙ্গতির মধ্যে হয়—তাহলে এটির জন্য কোনও শাস্তি প্রয়োগ করা হবে না। কোনরকম দাবী ছাড়া বর-বৌকে কিছু উপহার দেওয়া হলে—সেটি শাস্তির আওতায় আসবে না। তবে এই উপহারগুলি একটি বিস্তারিত তালিকা রাখতে হবে।)

এই আইনে নিম্নলিখিত বিধানগুলি আছে :

- পণ দিলে, পণ নিলে, অথবা পণ দেওয়া নেওয়ার ব্যাপারে কোনওরকম সাহায্য করলে ৫ বছরের কারাদণ্ড এবং কমপক্ষে ১৫, ০০০ টাকা (অথবা যৌতুকের মূল্য—যেটি বেশি পরিমাণ) জরিমানা হবে। তবে আদালতে উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে কারাদণ্ডের সময় কমানো যেতে পারে। (বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ এই অভিযোগগুলিতে অভিযুক্ত হলে, অভিযুক্ত ব্যক্তিদেরই প্রমাণ করতে হবে যে তারা নিরাপরাধ)।
- প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে পণের দাবী করলে ৬ মাস থেকে ২ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হবে। যদি কোন খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন মারফৎ পণের প্রলোভন দেখানো হয়, তাহলে সেই বিজ্ঞাপনদাতার ও কাগজের মুদ্রক, প্রকাশক ও প্রচারকের ৬ মাস থেকে ৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা ১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। তবে উভয়ক্ষেত্রেই আদালত কারণ দেখিয়ে

কারাদণ্ডের সময় ৬ মাস থেকে কমাতে পারে।

- ✪ কেবল নির্যাতিতা নারী নয়, যে কোন সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের অভিযোগও আদালতে মামলার জন্য গ্রাহ্য হবে।
- ✪ এই অপরাধে অভিযুক্তরা কোন জামিন পাবে না এবং তাদের নিজেদের মধ্যে কোন আপোস করার সুযোগ দেওয়া হবে না।
- ✪ অভিযোগ যে কোন সময়েই আনা চলবে—তার জন্য কোনও সময়সীমা বাঁধা নেই।

এই আইনের সঙ্গে ভারতীয় দণ্ডবিধির আরও দুটি ধারা যোগ করা হয়েছে। তার বলে, পণজনিত মৃত্যু বন্ধ করার জন্য এই আইনে বিধান আছে যে, বিয়ের সাত বছরের মধ্যে কোনও নারীর অস্বাভাবিক মৃত্যু হলে পুলিশকে সে ব্যাপারে তদন্ত করতে হবে। পণজনিত কারণে মৃত্যু ঘটলে অপরাধীদের ৭ বছর থেকে যাবজ্জীবন পর্যন্ত কারাদণ্ড হবে। এছাড়া, যদি কোন স্বামী বা তার আত্মীয় বধূর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করে যাতে বধূটি আত্মহত্যা করতে প্ররোচিত হয়, বা তার শারীরিক বা মানসিক স্বাস্থ্যের হানি নহয়, তাহলে তার (বা তাদের) ১০ বছরের পর্যন্ত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড হতে পারে। সম্পত্তি বা অন্যান্য বে-আইনী আর্থিক দাবী মেটাবার জন্য (বা মেটাতে না পারার জন্য) বধূকে উত্যক্ত করাটাও উপরোক্ত নিষ্ঠুর আচরণের সংজ্ঞায় পড়বে।

খোরপোষ বা ভরণপোষণ

খোরপোষ বা ভরণপোষণের ব্যবস্থা ভারতবর্ষের বিভিন্ন আইনে আছে। যেমন—ভারতীয় ফৌজদারী পদ্ধতি, ১৯৭৩ (Code of Criminal Procedure, 1973)-এর ১২৫ ধারা অনুযায়ী কোনও ব্যক্তির স্ত্রী, বৈধ কিংবা অবৈধ নাবালক সন্তান (তারা বিবাহিত হোক বা না হোক), শারীরিক বা মানসিক দিক থেকে প্রতিবন্ধী সাবালক সন্তান, পিতা বা মাতা যদি নিঃসম্বল হন এবং নিজেদের খরচপত্র চালাতে অসমর্থ হন, তাহলে সেই ব্যক্তিকে তাঁদের খোরপোষ দিতে হবে। সাবালক কন্যা যদি বিবাহিতা হয়, তাহলে তার খোরপোষ দাবী করার অধিকার নেই। এছাড়া ভরণ পোষণের ব্যবস্থা রয়েছে হিন্দু বিবাহ আইন, ১৯৫৫ ও হিন্দু দত্তক এবং ভরণপোষণ আইন, ১৯৫৬ অনুযায়ী।

প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট যদি প্রমাণপত্র দেখে নিশ্চিত হন যে, ব্যক্তিটি তাঁর উপর নির্ভরশীল উপরে উল্লিখিত পরিজনদের উপেক্ষা করছেন এবং ভরণপোষণে অস্বীকৃত হচ্ছেন, তাহলে ভারতীয় ফৌজদারী পদ্ধতি, ১৯৭৩, ১২৫ ধারা অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেট ঐ ব্যক্তিকে তাঁদের নিয়মিত মাসোহারা বা খোরপোষ দেবার হুকুম জারি করতে পারেন। সেই খোরপোষের পরিমাণ ম্যাজিস্ট্রেট নির্দিষ্ট করবেন এবং সময়ে সময়ে সেটা তাঁর নির্দেশে পরিবর্তিত হতে পারে।

এই ব্যবস্থায় স্ত্রী বলতে শুধু বৈধ স্ত্রী বোঝাচ্ছে না, যে নারীর সঙ্গে আইনগতভাবে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটেছে তাঁকেও বোঝাবে—যদি না তিনি আবার বিয়ে করে থাকেন। নাবালক বলতে বোঝাবে ভারতীয় সাবালকত্ব আইন, ১৯৭৫-এ যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এই আইন অনুসারে ১৮ বছরের অনুর্দ্ধরা নাবালক।

এই ব্যবস্থা অনুযায়ী স্ত্রী হিসেবে কোনও নারী খোরপোষ দাবী করতে পারবেন না, যদি তিনি অন্য কারোর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত থাকেন অথবা কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া স্বামীর সঙ্গে বসবাস করতে অস্বীকৃত হন, অথবা যেক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী নিজেদের মধ্যে সমঝোতা করে আলাদাভাবে বসবাস করছেন।

খোরপোষ বা ভরণপোষণের ব্যবস্থা হিন্দু বিবাহ আইন, ১৯৫৫ এবং হিন্দু দত্তক এবং ভরণপোষণ আইন, ১৯৫৬-তেও রয়েছে। ভরণপোষণ আইন, ১৯৫৬-তে স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীর ভরণপোষণ পাবার অধিকারের কথা বলা আছে। বিবাহিতা স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে স্বামী বাধ্য। একসঙ্গে বসবাস না করলেও স্ত্রী ভরণপোষণ দাবী করতে পারেন, যদি—

- ✪ স্বামী-স্ত্রীর অনুমতি বা সম্মতি ছাড়াই তাঁকে ফেলে রেখে চলে যান, ইচ্ছে করে স্ত্রীকে অবহেলা করেন বা যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই তাঁকে পরিত্যাগ করেন;
- ✪ স্ত্রীকে শারীরিক বা মানসিকভাবে এমন নির্যাতন করেন যে স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর সঙ্গে বসবাস করা ভয়বশত সম্ভব হয় না;
- ✪ স্বামী কোনও ভয়াবহ সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন;
- ✪ যদি সেই স্বামীর অন্য কোনও বিবাহিত স্ত্রী থাকেন;
- ✪ যদি স্বামী তাঁর রক্ষিতাকে বাড়িতে এনে সহবাস করেন;
- ✪ হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করে অন্য ধর্মগ্রহণ করেন;
- ✪ কিংবা অন্য কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণে;

প্রসঙ্গত হিন্দু দত্তক ও ভরণপোষণ আইনে সহায়-সম্বলহীন পুত্রবধূও শ্বশুরের কাছ থেকে খোরপোষ পেতে পারেন। সহায়-সম্বলহীন বলতে বোঝাছে যে, সেই নারী যদি নিজের খরচা চালাতে অসমর্থ হন, যদি তাঁর নিজের বা নিজের অধিকারে কোনও সম্পত্তি না থাকে এবং তাঁর স্বামীর জমি, বাড়ি ও অন্যান্য সম্পত্তি থেকে বা তাঁর পিতা বা মাতার জমি, বাড়ি ও অন্যান্য সম্পত্তি থেকে খরচ মেটাতে না পারেন।

হিন্দু বিবাহ আইনে রয়েছে যদি কোনও হিন্দু পুরুষ ব্যভিচারে লিপ্ত থাকেন কিংবা নিজের হিন্দু স্ত্রীকে নির্যাতন করেন কিংবা স্ত্রীর কোনও খোঁজ খবর না রাখেন, অকারণে সহবাস থেকে বিরত থাকেন; উপরন্তু তিনি স্ত্রীর বিরুদ্ধে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা আনেন কিংবা আইনসম্মতভাবে আলাদা থাকার দাবী করেন কিংবা সহবাসের অধিকার পুনঃস্থাপনের জন্য দাবী জানান, সেক্ষেত্রে সেই হিন্দু স্ত্রী আদালতের কাছে আর্থিক সুরাহা দাবী করতে পারেন। অর্থাৎ, বৈধ স্বামীর কাছ থেকে খোরপোষের দাবী করে দরখাস্ত করতে পারেন এবং মামলা চালানোর খরচাও দাবী করতে পারেন।

সূত্র : অবসর নেট

ফৌজদারী আইনের নারী নির্যাতন বিরোধী কয়েকটি ধারা

ভারতীয় দণ্ডবিধি

৩০৪-বি ধারা—পণের জন্য বধূমৃত্যু

যদি বিয়ের সাত বছরের মধ্যে কোনো গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় (আগুনে পুড়ে বা যেকোনো শারীরিক আঘাতে) এবং যদি দেখা যায়—মৃত্যুর কিছুদিন আগে কোনো ধরনের পণের দাবিতে তাঁর উপর তাঁর স্বামী বা স্বামীর আত্মীয়রা নিষ্ঠুর আচরণ অথবা হেনস্থা করেছে, তবে সেই মৃত্যুকে বলা হবে পণের জন্য মৃত্যু এবং সেই স্বামী ও স্বামীর আত্মীয়দের এই মৃত্যুর জন্য দায়ী বলে মনে করা হবে।

বি.দ্র.

(১) পণ নিবারণী আইন, ১৯৬১-র ২ নম্বর ধারায় পণ বলতে যা বলা আছে, এই ধারার জন্য পণ বলতে তাই বোঝানো হবে।

(২) যে ব্যক্তি পণের জন্য বধূমৃত্যু ঘটাবে তার কমপক্ষে সাতবছর কারাবাস, এমনকী যাবজ্জীবন কারাবাস হতে পারে।

● **শ্রেণি বিভাগ :** ***এই ধারায় মামলা হলে—***

(১) অপরাধীকে পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ছাড়া গ্রেপ্তার করতে পারে;

(২) অভিযুক্তের থানায় জামিন হবে না, কোর্ট থেকে জামিন নিতে হবে;

(৩) এই মামলার আপোশ মীমাংসা হবে না;

(৪) এই মামলার বিচার সেশন কোর্ট অর্থাৎ দায়রা আদালতে হবে।

● **মন্তব্য :** (১) ক্রমবর্ধমান বধূ মৃত্যুর ঘটনা প্রতিরোধ করার জন্য পণপ্রথা নিষিদ্ধকরণ আইন, ১৯৮৬-র মাধ্যমে ভারতীয় দণ্ডবিধিতে '৩০৪ বি' ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(২) সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শিশু জন্মানোর পর বা অন্য কোনো অনুষ্ঠানে টাকা বা উপহার দেওয়ার প্রথা আছে। এই ধরনের টাকা বা উপহার দেওয়া 'পণ' হিসাবে গণ্য হবে না।

৩০৪ বি ধারায় 'পণ' বলতে বিবাহ উপলক্ষ্যে দেওয়া বা দিতে রাজি হওয়া কোনো সম্পত্তি, দামি সঞ্চয়পত্র, নগদ অর্থ বা গহনা-গাটি বোঝাবে।

৩০৬ ধারা—আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়া

যদি কোনো ব্যক্তিকে (এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে মহিলা) আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়া হয়, তবে যারা প্ররোচনা দিয়েছে তাদের দশবছর পর্যন্ত কারাবাস এবং তার সঙ্গে জরিমানা হতে পারে।

● **শ্রেণি বিভাগ :** (১) এই অপরাধে পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ছাড়া গ্রেপ্তার করতে পারে;

(২) এটি জামিনযোগ্য অপরাধ নয় অর্থাৎ থানা থেকে জামিন হবে না;

(৩) আপোশ মীমাংসা হতে পারে না;

(৪) দায়রা আদালতে বিচার হবে।

● **মন্তব্য :** কোনো ব্যক্তিকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার জন্য শাস্তি দিতে হলে যিনি প্ররোচনার শিকার হয়েছেন তিনি যে আত্মহত্যা করেছেন তা প্রমাণ করতে হবে।

৩১২ ধারা—গর্ভপাত ঘটানো

যদি কোনো ব্যক্তি স্বেচ্ছায়, গর্ভবতী কোনো মহিলার গর্ভপাত ঘটায় এবং এই গর্ভপাত যদি মহিলার জীবনরক্ষার জন্য সৎ উদ্দেশ্যে না করা য়, তবে সেই ব্যক্তির তিন বছর কারাবাস অথবা জরিমানা অথবা দুটোই হতে পারে এবং যদি গর্ভপাত গর্ভাবস্থার সেই পর্যায়ে ঘটানো হয় যখন গর্ভের সন্তান নড়াচড়া করছে টের পাওয়া যাচ্ছে, তাহলে যিনি গর্ভপাত ঘটিয়েছেন তাঁর কমপক্ষে সাত বছরের কারাবাস এবং এর সঙ্গে জরিমানাও হতে পারে।

● **শ্রেণিবিভাগ :** ***এই ধারার মামলা হলে—***

(১) এই অপরাধে পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ছাড়া গ্রেপ্তার করতে পারে না;

(২) এটি জামিনযোগ্য অপরাধ অর্থাৎ থানা থেকে জামিন হতে পারে;

(৩) আপোশ মীমাংসা হতে পারে না;

(৪) প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বিচার হবে।

৩১৩ ধারা—মহিলার অনুমতি ছাড়া গর্ভপাত ঘটানো

কোনো ব্যক্তি কোনো মহিলার অনুমতি ছাড়া যদি ৩১২ ধারায় বর্ণিত অপরাধ করে তার গর্ভাবস্থা যে পর্যায়েই থাকুক না কেন (গর্ভের সন্তান নড়াচড়া করছে অথবা করছে না), অপরাধীর যাবজ্জীবন কারাবাস, অথবা দশবছর পর্যন্ত কারাবাস এবং তার সঙ্গে জরিমানাও হতে পারে।

● **শ্রেণি বিভাগ :** ***এই ধারায় মামলা হলে—***

(১) পুলিশ অপরাধীকে ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ছাড়া গ্রেপ্তার করতে পারে;

(২) অভিযুক্তের থানায় জামিন হবে না, কোর্ট থেকে জামিন নিতে হবে;

(৩) এই মামলার আপোশ মীমাংসা হবে না;

(৪) এই মামলার বিচার সেশন কোর্ট অর্থাৎ দায়রা আদালতে হবে।

৩১৪ ধারা—গর্ভপাত ঘটাতে গিয়ে মৃত্যু

কোনো গর্ভবতী মহিলার গর্ভপাত করানোর সময় যদি উক্ত মহিলার মৃত্যু ঘটে, তাহলে যে ব্যক্তি এই গর্ভপাত করাতে গিয়েছিল, তার দশ বছর পর্যন্ত কারাবাস ও তার সঙ্গে জরিমানাও হতে পারে।

যদি মহিলার অনুমতি ছাড়া উক্ত গর্ভপাত ঘটানো হয়ে থাকে তবে অপরাধীর যাবজ্জীবন কারাবাস অথবা উপরে উল্লিখিত শাস্তি হবে।

● **শ্রেণি বিভাগ :** ***এই ধারায় মামলা হলে—***

(১) পুলিশ অপরাধীকে ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ছাড়া গ্রেপ্তার করতে পারে;

(২) অভিযুক্তের থানায় জামিন হবে না, কোর্ট থেকে জামিন নিতে হবে;

(৩) এই মামলার আপোশ মীমাংসা হবে না;

(৪) এই মামলার বিচার সেশন কোর্ট অর্থাৎ দায়রা আদালতে হবে।

৩৬৬ ধারা

ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহে বাধ্য করার জন্য জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়া,

অপহরণ করা অথবা প্রলুব্ধ করা। নিম্নলিখিত কাজগুলি করার উদ্দেশ্যে যদি কোনো মহিলাকে জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়া বা অপহরণ করা হয়। যথা—

(১) তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো ব্যক্তিকে বিবাহ করতে বাধ্য করা;

(২) তাঁকে কোনো ব্যক্তির সহযোগে অবৈধ যৌন সঙ্গমে বাধ্য করা;

(৩) তাঁকে অবৈধ যৌনসঙ্গম করতে প্রলুব্ধ করা;

তাহলে যে ব্যক্তি এ কাজ করবে তার কম পক্ষে দশবছর কারাবাস এবং তার সঙ্গে জরিমানাও হতে পারে। কোনো মহিলাকে জোর করে বা লোভ দেখিয়ে অন্য কোনো ব্যক্তির সঙ্গে অবৈধ যৌনসঙ্গম করতে বাধ্য করানো হবে বা হতে পারে এটা জেনে এবং এই উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি কোনো কাজ করে, সেই অপরাধীর দশবছর পর্যন্ত কারাবাস এবং তার সঙ্গে জরিমানাও হতে পারে।

এই ধারায় মামলা হলে—

(১) পুলিশ অপরাধীকে ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ছাড়া গ্রেপ্তার করতে পারে;

(২) অভিযুক্তের থানায় জামিন হবে না, কোর্ট থেকে জামিন নিতে হবে;

(৩) এই মামলার আপোশ মীমাংসা হবে না;

(৪) এই মামলার বিচার সেশন কোর্ট অর্থাৎ দায়রা আদালতে হবে।

৩৬৬-এ ধারা—নাবালিকা সংগ্রহ করা

কোনো ব্যক্তি যদি ১৮ বছরের কম বয়সি কোনো নাবালিকাকে লোভ দেখিয়ে অন্য কোনো জায়গায় নিয়ে যায় অথবা সেই নাবালিকার উপর জোর খাটিয়ে বা লোভ দেখিয়ে অন্য কোনো ব্যক্তির সঙ্গে ওই নাবালিকাকে অবৈধ যৌনসঙ্গমে বাধ্য হতে পারে বা করানো হতে পারে এটা জেনে এবং এই উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করে, তবে অপরাধীর দশবছর পর্যন্ত কারাবাস এবং তার সঙ্গে জরিমানাও হতে পারে।

এই ধারায় মামলা হলে—

(১) পুলিশ অপরাধীকে ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ছাড়া গ্রেপ্তার করতে পারে;

(২) অভিযুক্তের থানায় জামিন হবে না, কোর্ট থেকে জামিন নিতে হবে;

(৩) এই মামলার আপোশ মীমাংসা হবে না;

(৪) এই মামলার বিচার সেশন কোর্ট অর্থাৎ দায়রা আদালতে হবে।

৩৬৬-বি ধারা

যদি কোনো ব্যক্তি ভারতের বাইরের কোনো দেশ থেকে অথবা জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য থেকে ২১ বছরের কম বয়সের মেয়েকে এটা জেনে নিয়ে আসে যে তাকে জোর খাটিয়ে বা প্রলোভন দেখিয়ে অন্য কোনো ব্যক্তির সঙ্গে অবৈধ সঙ্গমে বাধ্য করানো হবে তবে অপরাধীর দশ বছর পর্যন্ত কারাবাস ও তার সঙ্গে জরিমানাও হতে পারে।

এই ধারায় মামলা হলে—

(১) পুলিশ অপরাধীকে ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ছাড়া গ্রেপ্তার করতে পারে;

(২) অভিযুক্তের থানায় জামিন হবে না, কোর্ট থেকে জামিন নিতে হবে;

(৩) এই মামলার আপোশ মীমাংসা হবে না;

(৪) এই মামলার বিচার সেশন কোর্ট অর্থাৎ দায়রা আদালতে হবে।

৩৭২ ধারা

যদি কোনো ব্যক্তি যৌনব্যবসার উদ্দেশ্যে ১৮ বছরের কম বয়সি কোনো মেয়ে বা ছেলেকে বিক্রি করে, ভাড়া খাটায় বা অন্য কোনোভাবে হস্তান্তর করে এটা জেনে যে কোনো সময়ে তাদের যৌনব্যবসা বা কোনো ব্যক্তির সঙ্গে অবৈধ যৌনসঙ্গম বা অন্য কোনো ধরনের বেআইনি এবং অনৈতিক উদেশ্যে কাজে লাগানো ও ব্যবহার করা হবে বা হতে পারে তাহলে অপরাধীর দশ বছর কারাবাস এবং তার সঙ্গে জরিমানা হতে পারে।

৩৭৩ ধারা—যৌনব্যবসার জন্য নাবালিকা কেনা

যদি কোনো ব্যক্তি ১৮ বছরের কম বয়সি কোনো ছেলে বা মেয়েকে ভাড়া করে বা অন্য কোনোভাবে তাদের মালিক হয়ে যায়, এই উদ্দেশ্যে যে কোনো এক সময় তাদের যৌন ব্যবসা বা কোনো ব্যক্তির সঙ্গে অবৈধ যৌনসঙ্গম বা অন্য কোনো ধরনের বেআইনি এবং অনৈতিক কাজে লাগানো বা ব্যবহার করা হবে বা হতে পারে তাহলে অপরাধীর দশ বছর কারাবাস এবং তার সঙ্গে জরিমানা হতে পারে।

৩৭৭ নং ধারা—অস্বাভাবিক যৌন সঙ্গম

তাছাড়া ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৭ নং ধারায় বলা হয়েছে এমন কিছু

ক্ষেত্রে যদি কেউ প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে গিয়ে কোনো পুরুষ মহিলা, অথবা কোনো পশুর সঙ্গে অস্বাভাবিক যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে তবে তা হবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

এই অপরাধ জামিন অযোগ্য, আপোশ অযোগ্য, দায়রা আদালতে এই অপরাধের বিচার হবে।

● **শাস্তি :** দশবছর এমনকী আজীবন কারাবাস এবং তার সঙ্গে জরিমানা।

৪০৬ নং ধারা—বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধ

এই ধারাটি পুরুষ ও মহিলা সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। স্ত্রীধন উদ্ধার করার জন্য এই ধারার প্রয়োগ হয়। বিবাহের সময় স্ত্রীকে তার বাড়ি থেকে অলংকার (গয়না), আসবাবপত্র যা দেওয়া হয় এবং বিবাহের অনুষ্ঠানে সে যে উপহার পায় তাকে স্ত্রীধন বলা হয়। স্ত্রী শ্বশুরবাড়িতে সংসার করার সময় যদি স্ত্রীধন স্বামী বা শ্বশুরবাড়ীর কারো কাছে গচ্ছিত রাখে এবং স্বামী যদি ফেরত চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই স্ত্রীধন স্ত্রীকে ফেরত না দেন তবে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৬ ধারা অনুযায়ী স্বামী অথবা স্বামীর বাড়ির যার কাছে স্ত্রীধন গচ্ছিত আছে তার বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ করা যায়। পুলিশ প্রয়োজন হলে আদালতের মাধ্যমে তল্লাসি পরোয়ানা জারি করে ওই স্ত্রীধন উদ্ধার করে দিতে পারে।

এই অপরাধ জামিনঅযোগ্য, স্ত্রী আপোশ চাইলে হতে পারে, এই অপরাধ প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বিচার হবে।

● **শাস্তি :** তিন বছর পর্যন্ত কারাবাস অথবা জরিমানা অথবা উভয় শাস্তি হতে পারে।

৪৯৩ নং ধারা—বিবাহ সম্পর্কিত অপরাধ

যখন কোনো পুরুষ যে মহিলা তার আইনসম্মত বিবাহিতা স্ত্রী নন তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করে এই মর্মে তাঁর বিশ্বাস করায় যে তিনি তার আইনসম্মত বিবাহিতা স্ত্রী এবং সেই বিশ্বাসের ভিত্তিতে তার সঙ্গে বসবাস অথবা যৌনসঙ্গমে রাজি করায় তখন তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

এই অপরাধ জামিনঅযোগ্য, আপোশ অযোগ্য এবং প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে এই অপরাধের বিচার হবে।

● **শাস্তি :** দশ বছর পর্যন্ত কারাবাস এবং জরিমানা।

৪৯৪ নং ধারা

স্বামী বা স্ত্রী বেঁচে আছেন এমন অবস্থায় কোনো হিন্দু স্বামী বা স্ত্রী যদি আবার বিবাহ করেন তবে তা বাতিল হবে এবং এটি অপরাধ। অবশ্য আগের বিবাহকে কোন বৈধ আদালত বাতিল বলে ঘোষণা করলে অথবা স্বামী বা স্ত্রীর সাতবছর ধরে কোনো খোঁজ না থাকলে আদালতে আবেদন করে একতরফা বিচ্ছেদের রায় পেলে, পুনরায় বিয়ে করা যাবে। তখন এই ধারা প্রযোজ্য হবে না।

এই অপরাধ জামিনযোগ্য, আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আপোশযোগ্য, প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে এই অপরাধের বিচার হবে।

● **শাস্তি :** সাতবছর পর্যন্ত কারাবাস এবং জরিমানা।

৪৯৫ নং ধারা

আগের বিয়ে গোপন করে বর্তমান স্বামী বা স্ত্রীর জীবদ্দশায় যদি কোনো স্বামী বা স্ত্রী আবার বিবাহ করেন তবে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

এই অপরাধ জামিনযোগ্য, আপোশ অযোগ্য, প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে এই অপরাধের বিচার হবে।

● **শাস্তি :** দশবছরের কারাবাস এবং জরিমানা।

৪৯৬ নং ধারা

যদি কোনো পুরুষ অসাধু উদ্দেশ্যে বা ঠকাবার উদ্দেশ্যে সে আইনসম্মতভাবে বিয়ে করছে না একথা নিজে জেনেও বিয়ের অনুষ্ঠান করে তবে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

এই অপরাধ জামিনযোগ্য, আপোশ অযোগ্য, প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে এই অপরাধের বিচার হবে।

● **শাস্তি :** সাতবছর কারাবাস এবং জরিমানা।

৪৯৮ নং ধারা

অপরাধমূলক উদ্দেশ্যে কোনো বিবাহিতা মহিলাকে প্রলুব্ধ করা, ফুসলিয়ে নিয়ে যাওয়া বা আটকে রাখা।

কোনো ব্যক্তি কোনো বিবাহিতা মহিলাকে যাতে ওই মহিলা কোনো ব্যক্তির সঙ্গে অবৈধ যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হতে পারেন সেজন্য তাঁর স্বামী অথবা তাঁর স্বামী যার তত্ত্বাবধানে তাঁর স্ত্রীকে রেখেছেন তার কাছ থেকে তাঁকে ফুসলিয়ে নিয়ে যায়, কোথাও লুকিয়ে বা আটকে রাখে তবে তার সেই কাজ শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

● **শাস্তি :** দুবছর পর্যন্ত কারাবাস এবং জরিমানা অথবা উভয় শাস্তিই হতে পারে।

এই অপরাধ জামিনযোগ্য, আপোশযোগ্য এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে এই অপরাধের বিচার হবে।

৪৯৮ ক নং ধারা

বধূ নির্যাতন স্বামী বা তার আত্মীয়েরা যদি গৃহবধূর উপর নিষ্ঠুর আচরণ করে তবে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

● **শাস্তি :** তিনবছর কারাবাস এবং জরিমানাও হতে পারে।

এক্ষেত্রে নির্যাতিতার রক্তের সম্পর্কে সম্পর্কিত, বিবাহ সম্পর্কিত অথবা দত্তক সম্পর্কিত কোনো আত্মীয়, অথবা আত্মীয় না থাকলে রাজ্য সরকার নিয়োজিত কোনো সরকারি কর্মীর (সাধারণভাবে সমাজকল্যাণ আধিকারিক) মাধ্যমে থানায় অভিযোগ জানাতে হবে।

এই অপরাধ জামিন অযোগ্য, আপোশ অযোগ্য এবং প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে এই অপরাধের বিচার হবে।

নিষ্ঠুরতা বলতে বোঝায়—

(ক) এমন কোনো ইচ্ছাকৃত ব্যবহার যা কোনো গৃহবধূকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করতে পারে, সেই গৃহবধূর দৈহিক কোনো গুরুতব আঘাত সৃষ্টি করতে পারে বা তার জীবন, অঙ্গ বা স্বাস্থ্যের (দৈহিক বা মানসিক) গুরুতর হানি বা বিপদ ঘটাতে পারে।

(খ) কোনো সম্পত্তি বা মূল্যবান জিনিসের জন্য আইনবিরুদ্ধ দাবি করা বা কোনো মূল্যবান দ্রব্য বা সম্পত্তির দাবি না মেটাতে পারায় ওই গৃহবধূ বা তার পরিবারের উপর চাপ সৃষ্টি করা।

স্ত্রীধন আত্মসাৎ করাও নিষ্ঠুর ব্যবহার হিসাবে গণ্য করা হবে।

(গ) স্বামীর লাঞ্ছনা ও প্রহার, স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ, স্ত্রী-গর্ভে অন্য পুরুষের সন্তান আছে এমন সন্দেহ, গর্ভপাতে রাজি হওয়ার জন্য জোর করা এবং এই ধরনের উদ্দেশ্য প্রণোদিত ব্যবহার নিষ্ঠুরতার পর্যায়ে পড়ে।

৫০৯ নং ধারা

নারীর শ্লীলতাহানি বা সম্মানহানির জন্য খারাপ কথা বলা, অশালীন ও কুৎসিত ইঙ্গিত বা অঙ্গভঙ্গি করা, কোনো কিছু অশ্লীল বস্তু দেখানো বা ওই মহিলার নিজস্ব গোপনীয়তা (প্রাইভেসি) ভঙ্গ করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

● **শাস্তি :** তিন বছর পর্যন্ত কারাবাস ও জরিমানা।

ফৌজদারী আইনের কিছু সংশোধনী

বিগত ইং-২রা এপ্রিল ২০১৩ তারিখে কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রক থেকে লোকসভায় বিল পাশ করে ভারতীয় দন্ডবিধি, ফৌজদারী কার্যবিধি, ভারতীয় সাক্ষ্য আইন এবং যৌন অপরাধ থেকে শিশুদের সুরক্ষা আইন ২০১২ সমূহের সংশোধন করা হয়েছে।

এই সংশোধনী আইনকে ফৌজদারী আইন (সংশোধনী) ২০১৩ আইনরূপে অভিহিত করা হয়েছে।

এই আইন বিগত ৩রা ফেব্রুয়ারী ২০১৩ থেকে প্রচলিত করা হয়েছে।

ভারতীয় দন্ডবিধির ১০০ নং ধারার সংশোধন করা হয়েছে নিম্নরূপ :

উক্ত আইনের ১০০ নং ধারা উপধারার ৬নং এরপর, ৭ম উপধারার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে নিম্নরূপ :

অ্যাসিড ছোড়া, অ্যাসিড দেওয়া বা অ্যাসিড দেওয়ার চেষ্টা করা, যার ফলে গুরুতম জখম বা আঘাত পাওয়ার আশঙ্কা বা তার ফলাফল এই আইনে অন্তর্ভুক্তি হয়েছে।

ভারতীয় দন্ডবিধির ৩২৬ক ও ৩২৬খ ধারার সংযুক্তি : ৩২৬ক ইচ্ছাকৃতভাবে অ্যাসিড ছুঁড়ে ভয়ঙ্কর আঘাত করা :

যেকোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে অ্যাসিড ছুঁড়ে বা শরীরে ঢেলে সেই ব্যক্তিকে আঘাত বা ক্ষতিগ্রস্ত করার অভিপ্রায়ে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আংশিক বা সম্পূর্ণ ক্ষতি করে সেই অপরাধী ব্যক্তির ন্যূনতম ১০ বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড বা যাবজ্জীবন শাস্তি হবে এবং জরিমানাও ধার্য হবে। সেই জরিমানার পরিমাণ সেই আক্রান্ত ব্যক্তি চিকিৎসার খরচ অনুযায়ী ধার্য হবে। পরবর্তীকালে আরও জরিমানা হতে পারে।

ভারতীয় দন্ডবিধির ৩২৬খ

ইচ্ছাকৃতভাবে অ্যাসিড ছোড়া বা ইচ্ছাকৃতভাবে অ্যাসিড ছোড়ার অপচেষ্টা :

যে কোন ব্যক্তি যদি অপর কোন ব্যক্তির উপর অ্যাসিড ছোঁড়ে বা অ্যাসিড ছোঁড়ার চেষ্টা করে সেই ব্যক্তির শরীরে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত করে বা পুড়িয়ে

দেয়, সেই অপরাধী ব্যক্তির নূন্যতম ৫ বৎসর জেল ও সর্বাধিক ৭ বৎসর জেল এবং জরিমানা ধার্য হয়।

ভারতীয় দন্ডবিধির বিদ্যমান ৩৫৪ ধারার সাথে ৩৫৪ক, ৩৫৪খ ও ৩৫৪গ ধারার অন্তর্ভুক্তি।

৩৫৪ক, যৌন নির্যাতন এবং যৌন নির্যাতনের শাস্তি।

যদি কোন ব্যক্তি (পুরুষ) নিম্নলিখিত অন্যায় কাজ করেন।

(ক) অবাঞ্ছিত শারীরিক সম্পর্ক করেন।

(খ) যৌন সংক্রান্ত কর্মের চাহিদা বা অনুরোধ করে।

(গ) কোন মহিলার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পর্ণোগ্রাফী প্রদর্শন করা।

(ঘ) যৌন রঞ্জিত কথাবার্তা বলা।

উপরোক্ত (ক), (খ) ও (গ) ধারায় বর্ণিত অপরাধ সংগঠন কালে সেই ব্যক্তির ৩ বৎসর জেল ও জরিমানা ধার্য হবে বা উভয়েই ধার্য হইবে।

উপরোক্ত (ঘ) উপধারায় কোন ব্যক্তি অপরাধ করিলে সেই ব্যক্তির ১ বৎসর জেল এবং জরিমানাও ধার্য্য হবে।

৩৫৪খ ... প্রহার বা কোন মহিলাকে বে-আব্রু করার জন্য বে-আইনী বলপ্রয়োগ।

যে কোন ব্যক্তি যিনি কোন মহিলাকে বেআব্রু করার জন্য বেআইনী বল প্রয়োগ করেন সেই মহিলাকে বেআব্রু বা নগ্ন হতে বাধ্য করেন, সেই অপরাধীর নূন্যতম ৩ বৎসর জেল বা সর্বাধিক ৭ বৎসর জেল এবং জরিমানা ধার্য হবে।

৩৫৪(গ) ধারা :

ভয়ারিজম/পিছু ধাওয়া :

যে কোন বক্তি অন্য কোন মহিলার ব্যক্তিগত কাজের অনুসরণ করে তার ব্যক্তিগত কাজের ছবি তোলে, যাতে তার গোপনীয়তা ক্ষুন্ন হয় এবং তিনি অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন, সেই অপরাধী ব্যক্তির নূন্যতম পক্ষে একবছর এবং সর্বাধিক তিন বছর এর জেল হতে পারে (প্রথমবার অপরাধ সংগঠিত করলে) এবং ঐ অপরাধ যদি দ্বিতীয়বার করেন তাহলে সেই ব্যক্তির ন্যূনতম তিন বৎসর সর্বাধিক সাত বছর জেল এবং জরিমানাও হবে।

ব্যাখ্যা-১ : ব্যক্তিগত কাজ বলতে বোঝায় কোন ব্যক্তি কোন মহিলার একান্ত নিজস্ব কাজকর্ম বা তার শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দিকে উঁকি মারা বা

আংশিক আবৃত অবস্থায় অবাঞ্ছিত দৃষ্টি দেওয়া বা সেই মহিলার কোন শৌচাগারের কাজকর্ম অনুসরণ করা, যেটা জনসমক্ষে বাঞ্ছিত নয় সেই রকম যৌন কাজকর্ম।

ব্যাখ্যা-২ : যেখানে মহিলা তাঁর ছবি তোলায় সম্মতি দিয়েছেন, কিন্তু সে ছবি কোন তৃতীয় ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করার সম্মতি দেননি, সেখানে সেই ছবি প্রকাশ করলে সেই কাজ এই ধারায় অপরাধ বলে গণ্য হবে।

৩৫৪(ঘ) ধারা :

কোন ব্যক্তি যেকোন মহিলার সহিত যোগাযোগ করার চেষ্টা করলে এবং তার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কোন অসৎ উদ্দেশ্যে পরিচয় করার চেষ্টা করে বা ইন্টারনেট ই-মেল অন্যান্য ইলেকট্রনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে কোন মহিলার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার চেষ্টা করেন, সেই চেষ্টা বা অপচেষ্টাকে বলা হয় স্টকিং, অবশ্য নিম্নলিখিত কার্য্যবলী স্টকিং-এর মধ্যে পড়ে না।

১. যেখানে কোন অপরাধের তদন্ত করার জন্য এই ধরণের পিছু ধাওয়া করা হয়।

২. আইন যেখানে কোন মহিলাকে অনুসরণ করার জন্য আদেশ দেন।

৩. যেক্ষেত্রে উপরিউক্ত কাজ ন্যায়সঙ্গত এবং যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করা হয়।

যে ব্যক্তি উপরোক্ত স্টকিং অপরাধের আওতায় পড়ে সেই ব্যক্তিদের প্রথমবার অপরাধ করিলে তিন বৎসর নূন্যতম জেল এবং দ্বিতীয়বার অপরাধ করলে তার সাজা হবে ৫ বছর জেল এবং জরিমানা।

অমলেশ কান্তি ঘোষাল
আইনজীবী

তথ্যসূত্র ঃ প্রয়াস, ডিসেম্বর, ২০১৫ সংখ্যা।

থানা-পুলিশের ব্যাপারে নারীদের অধিকার

আপনাকে পুলিশ জেরা করতে চাইলে—তা যেন আপনার নিজের বাড়িতে পরিবারের অন্যান্যদের উপস্থিতিতে করা হয়—এটি আপনি চাইতে পারেন। পুলিশ আপনাকে থানায় বা অন্য কোথাও নিয়ে যেতে চাইলে—তাতে রাজি না হবার অধিকার আপনার আছে।

আপনাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে এলে—গ্রেপ্তারের কারণ জিজ্ঞাসা করার, থানায় আপনার কোনও আত্মীয় বা বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার, পুলিশ হাতকড়া লাগাতে চাইলে তা পরতে অস্বীকৃত হবার এবং গ্রেপ্তারের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আপনাকে উপস্থিত করানোর দাবি জানানোর অধিকার আপনার আছে।

থানায় পুলিশ আপনাকে আটক করে রাখতে চাইলে, মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত লক-আপে রাখার দাবি আপনি জানাবেন। থানায় থাকার সময়ে পুলিশ কোনও দুর্ব্যবহার, মারধোর বা শারীরিক অত্যাচার করলে ডাক্তারী-পরীক্ষার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দাবি জানানোর অধিকার আপনার আছে।

আপনাকে তল্লাসি করতে চাইলে একজন মহিলা—পুলিশই আপনাকে তল্লাসি করতে পারবেন—পুরুষ নয়। তল্লাসির আগে যিনি আপনাকে তল্লাসি করলেন, তাঁকে আগে তল্লাস করে দেখার অধিকার আপনার আছে—যাতে তিনি কিছু লুকিয়ে এনে আপনার কাছে পেয়েছেন বলে দাবি না জানাতে পারেন।

এফ.আই.আর (ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট) ফাইল করার অধিকার আপনার আছে। এফ.আই.আর ফাইল করার পর সেটি যেন ঠিকমত রেজিস্ট্রিভুক্ত করা হয়—সেটি আপনি দেখবেন। এফ.আই.আর ফাইল করার সময় আপনার আত্মীয় বা বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া, কাগজে সই করার আগে সেটি পড়ে দেখা বা কাউকে দিয়ে তা পড়িয়ে শুনে নেওয়ার অধিকার আপনার আছে। এফ.আই.আর-এর একটি কপি আপনি চেয়ে রাখবেন—বিনামূল্যে এফ.আই.আর কপি আপনার প্রাপ্য। স্থানীয় পুলিশ যদি আপনার এফ.আই.আর নিতে অস্বীকার করে, তাহলে উর্দ্ধতন পুলিশ অফিসারের কাছে বা এলাকার ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

মহিলাদের সম্পত্তি সংক্রান্ত আইন

আমাদের দেশ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের দেশ, প্রধানতঃ হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান মহিলাদের সম্পত্তি সংক্রান্ত আইন নিয়ে হল এই লেখার আলোচ্য বিষয়।

প্রথমতঃ হিন্দু মহিলাদের ক্ষেত্রে ১৯৫৬ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার আইন প্রণয়নের আগে, হিন্দু মেয়েদের কেবলমাত্র বাসস্থানের অধিকার ছিল সঙ্গে ভরণপোষণের অধিকারও ছিল। বিগত ১৯৫৬ সালে হিন্দু উত্তরাধিকার আইন প্রণয়নের পর হিন্দু মহিলারা হিন্দু পুরুষদের সঙ্গে সমান অধিকার লাভ করে। অর্থাৎ মৃত বাবার সম্পত্তি (কোন দলিল দস্তাবেজ ছাড়া) ভাইদের সঙ্গে সমান অংশে অধিকারিনী হত। অতঃপর বিগত ২০০৫ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার আইন সংশোধন হয় তাতে হিন্দু মহিলারা (বিবাহিত বা অবিবাহিত) মৃত পিতার সম্পত্তি পার্টিশান দাবী করার অধিকারিনী হন। এর সঙ্গে বিবাহিত মহিলারা মৃত পিতার বাড়ীতে বা পিতার জীবদ্দশায় পিতার বাড়ীতে বসবাস করার অধিকারও পায়। পরবর্তীকালে সাম্প্রতিককালে মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয় (সুপ্রিম কোর্ট) ওই মর্মে একটি রায় দান করেন যেখানে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট পর্যবেক্ষণ করেন যে, ৯ই সেপ্টেম্বর ২০০৫ এর পূর্বে যদি কোন হিন্দু পিতা মারা যান দলিল দস্তাবেজ বা উইল না করে সেক্ষেত্রে তার কন্যারা কোন পার্টিশান দাবী করিতে পারবে না বা তাদের অংশ দাবী করিতে পারবে না, যতক্ষণ না, ভাইয়েরা সম্পত্তি ভাগ বাঁটোয়ারা করছেন অথবা সম্পত্তি বিক্রি হলে বিক্রয়লব্ধ অর্থের আনুপাতিক অংশ বোনেদের দিতে বাধ্য থাকবেন। কিন্তু ৯ই সেপ্টেম্বর ২০০৫ এর থেকে বা তারপরে যদি কোন হিন্দু পিতা মারা যান তাহলে মৃত পিতার সম্পত্তির উপর পার্টিশানসহ সবরকম অধিকার পাবে।

এবারে আসা যাক মুসলিম মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কে। ভারতের মুসলিম আইনে প্রধানত দুটি ধারা আছে—হানাফি (সুন্নী) ও শিয়া। সুন্নী আইন অনুযায়ী মৃতের পুরুষ আত্মীয় এবং তাদের সন্তানরা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন। যথা পুত্র, পুত্রের পুত্র, পুত্রের কন্যা এবং পিতার মাতা

ইত্যাদি। শিয়াদের ক্ষেত্রে কন্যার দিকে বা মাতার দিকের আত্মীয়দের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হিসাবে স্বীকৃতি দেয় যথা কন্যার পুত্র, কন্যার কন্যা প্রভৃতিরা উত্তরাধিকারীর স্বীকৃতি পাবে।

এ প্রসঙ্গে কয়েকটি সাধারণ সূত্র হল সম্পত্তির দাবীদার উত্তরাধিকারীরা যদি মৃতের সমান নিকট আত্মীয় হয় তারা তাহারা সবাই সম্পত্তিতে সমান অধিকার পাবে। পুরুষ উত্তরাধিকারী নারীর দ্বিগুণ সম্পত্তি পাবে। এছাড়া একজন যদি মৃতের সঙ্গে অন্যের মাধ্যমে সম্পর্কিত হয়, তাহলে তিনি না মারা গেলে সম্পর্কিত ব্যক্তি সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাবে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে মৃতের সঙ্গে উত্তরাধিকারীর সম্পর্ক ও সংখ্যার মাধ্যমে সম্পত্তির অংশ নির্ধারিত হবে। কে কতটা পাবেন তা সম্পর্কের উপর নির্ভর করবে। আরো আলোচ্য বিষয় এই যে, কোন বিধবা মুসলিম স্ত্রী তার স্বামীর সম্পত্তির ১/৪ অংশ পাবেন যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে, সন্তান থাকলে উক্ত সম্পত্তির ১/৮ অংশ। আরো উল্লেখ্য কোন মুসলিম মাতা, তার পুত্র মারা গেলে সেই পুত্রের সন্তান না থাকলে তিনি ১/৩ (একের তিন) অংশ পাবেন, কিন্তু সন্তান থাকিলে ১/৬ অংশ পাবেন।

কোন মুসলিম নারী তার মোট সম্পত্তির ১/৩ (একের তিন) অংশের বেশি বিলি ব্যবস্থা করতে পারেন না, কিন্তু কোন নারী যদি কোন রক্তের সম্পর্কের আত্মীয় জীবিত না থাকেন এবং স্বামীই তার একমাত্র উত্তরাধিকারী হন তাহলে সেই মুসলিম স্ত্রী তার স্বামীর নামে ২/৩ অংশ পর্যন্ত দান করতে পারেন। এই অংশ স্ত্রীকে দাফন খরচ এবং ঋণ শোধের পরে হিসাবে করা হবে।

এবার খ্রীষ্টান মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

খ্রীষ্টান মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার ১৯২৫ সালের ভারতীয় উত্তরাধিকারী আইন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়। খ্রীষ্টান মহিলাদের সম্পত্তির অধিকারের ব্যাপারে মূল বিষয়টি হল একজন খ্রীষ্টান বিধবা স্বামীর সম্পত্তির ১/৩ অংশ পাবেন, বাকি সম্পত্তি সন্তানদের মধ্যে (পুত্র-কন্যা নির্ব্বিশেষে) সমানভাবে ভাগ হবে, এমনকি কন্যা বিবাহিতা হলেও পিতার সম্পত্তির সমান অংশ পাবে, অন্যান্য ভাই বোনদের মতই। কন্যা বা পুত্র মারা গিয়ে থাকলে মৃত বা মৃতার সন্তানরা বাবা বা মার সম্পত্তির অংশ পাবে। বিবাহের সময় প্রদত্ত যে কোন উপহার গ্রহীতার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। সম্পত্তি বন্টনের সময়

সেই উপহারকে ধরা হবে না। আরও উল্লেখ্য খ্রীষ্টান মহিলারা বিবাহের সময় যৌতুক পাওয়া সত্ত্বেও, তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তির ভাগ পাবেন।

পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ আইন ২০০৫ অনুযায়ী যে কোন পারিবারিক সম্পর্কের মহিলা (হিন্দু, মুসলিম, খ্রীষ্টান বা যে কোন সম্প্রদায়) সম্পর্ক হিসাবে পারিবারিক সম্পর্কের পুরুষের সম্পত্তিতে বসবাস করার অধিকারিনী। উক্ত আইনে হিন্দু, মুসলীম, খ্রীষ্টান এই ব্যাপারে কোন ভেদাভেদ নেই।

অমলেশ কান্তি ঘোষাল

আইনজীবী

পারিবারিক নির্যাতন থেকে নারীদের সুরক্ষা আইন, ২০০৫

যে-ব্যক্তির (পুরুষ) সঙ্গে আপনি অর্থাৎ কোনো মহিলা বাস করেন তিনি যদি আপনাকে শারীরিকভাবে আঘাত করেন, হুমকি বা শাসানি দেন অথবা হয়রানি করেন, তবে আপনি নিজেকে পারিবারিক হিংসার শিকার বলে ভাবতে পারেন ও পারিবারিক নির্যাতন থেকে নারীদের সুরক্ষা আইন, ২০০৫ অনুসারে প্রতিকার চাইতে পারেন। যেমন—মহিলারা এবং ১৮ বছরের নীচে পরিবারভুক্ত ছেলে বা মেয়েও এই আইনের আওতায় আসবে।

যে-ব্যক্তির সঙ্গে আপনি একসঙ্গে একই বাড়িতে বাস করেন তিনি যদি আপনার বা আপনার হেফাজতে ও তত্ত্বাবধানে থাকা কোনো শিশুর সঙ্গে নিম্নবর্ণিত কোনো অসদাচরণ করেন তবে আপনি উক্ত আইন অনুসারে প্রতিকার পেতে পারেন—

(ক) শারীরিক অত্যাচার

১. মারধর করা;

২. চড় মারা;

৩. আঘাত করা;

৪. লাথি মারা;

৫. ঘুসি মারা;

৬. বলপূর্বক ঠেলা মারা;

৭. ধাক্কা মারা; কিংবা

৮. অন্য কোনোভাবে শারীরিক আঘাত করা/বা আহত করা;

(খ) যৌন অত্যাচার

১. জোর করে যৌনসঙ্গম করা;

২. জোর করে অশ্লীল ছবি বা উপাদান দেখানো;

সূত্র : সানন্দা পত্রিকায় পূর্ব-প্রকাশিত

৩. এমন কোনো যৌন আচরণ করা যা আপনার মর্যাদার পক্ষে অবমাননাকর;

৪. শিশুর প্রতি যৌন অত্যাচার বা যৌননিগ্রহ;

(গ) মৌখিক ও আবেগজনিত অত্যাচার

১. অপমান করা/খোঁটা দেওয়া;

২. গালাগালি দেওয়া;

৩. চরিত্রহনন বা চারিত্রিক অপবাদ দেওয়া;

৪. পুত্রসন্তান না হওয়ার জন্য খোঁটা দেওয়া;

৫. পণ বা যৌতুক আনতে না পারার জন খোঁটা দেওয়া;

৬. আপনাকে বা আপনার হেফাজতে থাকা শিশুটিকে জোর করে বিদ্যালয়/কলেজে যেতে না দেওয়া বা পড়াশোনা বন্ধ করে দেওয়া;

৭. আপনাকে চাকরি বা কাজ করতে না দেওয়া;

মধুপূর্ণা ঘোষ
সমাজসেবী ও আইনজীবী

সূত্র : সানন্দা পত্রিকায় পূর্ব-প্রকাশিত

সন্তানের হেফাজত সংক্রান্ত আইন

বর্তমান পরিস্থিতিতে সমাজে বিবাহবিচ্ছেদ বা দম্পতিদের মিউচুয়াল সেপারেশন অর্থাৎ পারস্পরিক সম্মতিতে স্বেচ্ছায় আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত আর কোন বিরল ঘটনা নয়। প্রচুর দম্পত্তি বিবাহ বিচ্ছেদের জন প্রতিদিন আদালতের স্মরণাপন্ন হচ্ছেন। যখন বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা দায়ের হয় বা দাম্পত্যজীবনে কোন কারণে মতভেদ সৃষ্টি হয়ে স্বামী ও স্ত্রী আলাদা থাকতে শুরু করেন তখন অন্যান্য বিষয়ে মতভেদের মতো সন্তান বা সন্তানদের হেফাজত অর্থাৎ তারা কার কাছে থাকবে এবং তাদের বরণপোষণ এবং অন্য দায়িত্ব কে নেবেন এ বিষয়গুলি নিয়েও বহুক্ষেত্রে দম্পতিরা একমত হতে পারেন না। পারস্পরিক আলোচনার দ্বারা অনেকসময় কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয় না। এর ফলে শুরু হয় তীব্র দ্বন্দ্ব। দুপক্ষেরই দাবী যে সন্তান থাকবে তাঁর হেফাজতে। এই পরিস্থিতিতে দুজনেই আদালতের স্মরণাপন্ন হতে বাধ্য হন। শুরু হয় আইনী লড়াই। এই লড়াও ক্ষেত্রবিশেষে অন্য মামলার মত দীর্ঘায়িত হয়। কয়েকটা ঘটনা বা কেস স্টোরি থেকে তুলে ধরা হল—

মা বাবার বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতনের মামলা করেছে। তিনি যৌথ গৃহস্থালী ছেড়ে নিজের বাবা মার বাড়ী চলে গেছেন। একমাত্র পুত্র সন্তান নাবালক। মা চলে যাবার সময়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে গেছেন। চিকিৎসক বাবা ছেলের সঙ্গ চান এবং আরো চান তাকে মনের মত করে শিক্ষা দিতে। মা একেবারেই দেখা করতে দিতে চান না, আর পড়ানো তো দূরস্থান। ছেলের জন্মদিনে বাবা গেলেন দেখা করতে ছেলের জন্য অনেক উপহার নিয়ে। প্রথমে তো দরজা খোলাতে পারলেন না। অতঃপর প্রতিবেশীরা এসে সবাই মিলে অনুরোধ করে দরজা খোলানোর পর দেখা গেল যে ছেলে বাবার সঙ্গে দেখা করতে নারাজ। বন্ধ দরজার ওপার থেকে বাবাকে চলে যেতে বলছে। বাবা অতঃপর স্কুলে গেলেন। স্কুলেও ছেলে কাছে আসতে চাইলো না বরং সে বাবাকে বললো তিনি যেন আর কখনও দেখা করতে না আসে। বাবা শোকে মূহ্যমান।

দ্বিতীয় ঘটনা বাবা মা দুজনে আপোষে বিবাহ বিচ্ছেদ করেছেন। চুক্তি অনুযায়ী স্থায়ী হেফাজত নিয়েছেন মা এবং বাবা মেয়ের সঙ্গে শনিবার, রবিবার ও অন্যান্য ছড়টির দিনে দেখা করতে পারবেন (Visiting right)।

প্রথম প্রথম ঠিক চলছিল। এরপর বাবা যখনই দেখা করতে চান মেয়েটির মা বলে দেন যে মেয়ে বাড়ী নেই বা এখন পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত, দেখা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। বাবা বুঝতে পারছেন যে তিনি সন্তানের সাহচর্য্যে বঞ্চিত হচ্ছেন। ফোন করলে তিনি বুঝতে পারেন যে মেয়ে দেখা করতে উদগ্রীব কিন্তু ভয় পাচ্ছে।

এই ধরনের ঘটনায় বাচ্চারা বাবা ও মার মতবিরোধ এবং বিচ্ছেদের শিকার। সহজ বুদ্ধিতে বোঝা যায় যে যার হেফাজতে সন্তানটি থাকে তিনি অন্য পক্ষ সম্পর্কে এমন বিরূপ কথাবার্তা বলেন এবং বাচ্ছাটির মগজ ধোলাই করেন যে বাচ্ছাটি ভয় পায় বা শংকিত হয়ে পড়ে। অনেক সময় অস্বাভাবিক আচরণও করে।

এই ধরণের শিশুরা বঞ্চিত হয় বাবা বা মা কোন একজনের স্নেহ, মায়া, মমতা ও সঙ্গ থেকে। সে আর পাঁচটা তার বয়সী শিশুর তুলনায় সুস্থ পরিবেশে বড় হওয়ার সুযোগ পায় না। আমাদের দেশে একটি শিশুর বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে পরিবারের তথা বাবা ও মায়ের ভূমিকাই প্রধান। তাই পরিবার ভেঙ্গে গেলে বাবা ও মা আলাদা হয়ে গেলে শিশুরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উন্নত দেশে শিশুদের জন্য রাষ্ট্রের শক্তিশালী হস্তক্ষেপ থাকে তাই সেখানে শিশুরা তুলনামূলকভাবে কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আমাদের দেশে শিশুদের হেফাজত ও তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে আইন তা হল 'গার্ডিয়ান এন্ড ওয়ার্ডস অ্যাক্ট, ১৮৯০'। এই আইনে শিশুদের হেফাজত, অভিভাবিক নিয়োগ ও তাদের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উপযুক্ত বিধান দেওয়া আছে।

যদি কোন শিশুর হেফাজত নিয়ে বাবা মার মতভেদ হয় তবে এই আইন অনুযায়ী মামলা করতে হবে শিশু যেখানে রয়েছে সেই জেলার নির্দিষ্ট জেলা কোর্টে। যে শিশুর পিতা জীবিত তার ক্ষেত্রে এই আইনে অভিভাবক নিযুক্ত অন্য কেউ হতে পারবেন না। বাবা বা মা কার হেফাজতে শিশু থাকবে সে বিষয়ে আদালত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিতে পারেন।

শুধুমাত্র, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের জন্য ১৯৫৬ সালে প্রণীত হয় 'দি হিন্দু মাইনরিটি এন্ড গার্জেনশিপ অ্যাক্ট'। এই আইন হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ ও ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী সব মানুষের জন্য। এই আইন অনুযায়ী মাইনর হল সেই ছেলে বা মেয়ে যার ১৮ বছর বয়স পূর্ণ হয়নি।

এই আইন অনুযায়ী পুত্র বা কন্যা যাই হোক তার স্বাভাবিক অভিভাবক হবেন বাবা। কিন্তু পাঁচবছর অবধি শিশুর হেফাজত থাকবে মায়ের কাছে।

অবৈধ সন্তানের ক্ষেত্রে তার অভিভাবকত্ব থাকবে মায়ের কাছে। ১৮ বছরের নিচে পুত্র বা কন্যার ক্ষেত্রে অভিভাবকত্বের প্রশ্ন আসে।

সৎ বাবা ও মা কিন্তু স্বাভাবিক বাবা মায়ের সংজ্ঞাভুক্ত নয়। শিশুদের অভিভাবকত্বের সাথে সাথে তাদের সম্পত্তির দেখাশুনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করার দায়িত্ব থাকবে অভিভাবকদের। কিন্তু নাবালকের সম্পত্তি হস্তান্তরের আগে আদালতের অনুমতি ছাড়া কোন হস্তান্তর বৈধ নয়। দত্তক গ্রহণের ক্ষেত্রে দত্তক সন্তানের প্রথম অভিভাবক তার পালক পিতা ও পিতার পরে তার পালক মাতা।

সাময়িক হেফাজতের জন্য কোন মহিলা 'পারিবারিক হিংসা হতে সুরক্ষা আইন, ২০০৫' অনুযায়ী মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আবেদন করতে পারেন।

যদি কোন মহিলা পারিবারিক হিংসা আক্রান্ত হন এবং বলপূর্বক তাঁকে তাঁর অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের থেকে আলাদা করে দেওয়া হয় তবে তিনি আদালতে সাময়িক হেফাজত চাইতে পারেন। কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এই মামলায় হবে না। স্থায়ী হেফাজতে চাইলে দেওয়ানী আদালতে যেতে হবে এবং আদালত সিদ্ধান্ত জানাবার আগে বিচার ও বিবেচনা করবেন যে শিশুটির সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কার কাছে থাকলে সম্ভব হবে। সেটি স্থির করার পরেই আদালত রায় দান করবেন।

ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের জন্য ঃ এক্ষেত্রে মা শিশুর হেফাজত পাবেন। শিশুটি পুরুষ হলে তার ৭ বছর বয়স পর্যন্ত এবং মহিলা হলে তার বয়ঃসন্ধি পর্যন্ত। মায়ের এই অধিকার বিবাহ বিচ্ছেদের পরেও থেকে যায়। যদি না তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেন। মা যদি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন সেক্ষেত্রে শিশুর হেফাজত চলে যাবে তার বাবার কাছে।

নাবালিকা হলে বিবাহিত মুসলিম কন্যাসন্তানের হেফাজত তার মায়ের যতদিন না মেয়েটি বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছায়।

নাবালকের সম্পত্তির আইনত অভিভাবক হবেন বাবা, বাবার উইল (will) দ্বারা নিযুক্ত executor, বাবার বাবা অর্থাৎ দাদু অথবা দাদুর উইল দ্বারা নিযুক্ত executor। আইনী কিছু সুনির্দিষ্ট কারণ ব্যতীত নাবালকের সম্পত্তি কেউ বিক্রয় করে দিতে পারবেন না।

মধুপূর্ণা ঘোষ
সমাজসেবী ও আইনজীবী

কর্মক্ষেত্রে নারীর যৌন হেনস্থা (নিবারণ, প্রতিরোধ ও প্রতিকার) আইন

কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থার অভিযোগ জানাতে হলে ঘটনার তিন মাসের মধ্যে অভিযোগ জানান। যদি একাধিকবার ঘটনাটি ঘটে তাহলে শেষবার ঘটনা ঘটার তিন মাসের মধ্যে অভিযোগ যানান।

যৌন হেনস্থা কাকে বলে? যে কোনও ধরনের অবাঞ্ছিত সরাসরি বা যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ ব্যবহার বা অবাঞ্ছিত শারীরিক স্পর্শ অথবা কোনও অনভিপ্রেত যৌন আনুকূল্যের দাবি মেটানোর অনুরোধ করা বা সে বিষয়ে ইঙ্গিত দেওয়া বা যৌন বিষয়ক বা যৌনতা মিশ্রিত মন্তব্য করা বা অশ্লীল ছবি কোনও মহিলাকে প্রদর্শন করা যৌন হেনস্থার অন্তর্গত। (ধারা ২ এল) সুপ্রিম কোর্ট ১৯৯৭ সালে কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের যৌন হেনস্থা প্রতিরোধ ও প্রতিকার করার জন্য যৌন হেনস্থার সংজ্ঞা প্রণয়ন করেন ও কর্মক্ষেত্রের আধিকারিকদের জন্য একটি সুস্পষ্ট নির্দেশিকা দেন এবং সমস্ত কর্মক্ষেত্রে নির্দেশিকাটি কার্যকর করার নির্দেশ দেন। এই নির্দেশিকাটি 'বিশাখা গাইডলাইন' হিসেবে বিখ্যাত। এরপর সরকার ২০১৩ সালে কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের যৌন হয়রানি (প্রতিরোধ, নিরোধক ও প্রতিকার) আইন ২০১৩ জারি করে।

এই আইনে নির্ধারিত মহিলা কারা? আইনের ২(৩) ধারায় বলা আছে নির্যাতিত মহিলা বলতে বোঝাবে যে কোনও বয়সের মহিলা, যিনি যে কোনো জায়গায় চাকরিরত বা সেখানে বহিরাগত হিসেবে চাকরির সূত্রে এসেছেন যিনি অপরপক্ষ দ্বারা কর্মক্ষেত্রে উপরিউক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী কোনও ধরনের যৌন হয়রানির অভিযোগ করেছেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যাঁরা বাড়িতে গৃহ পরিচারিকার কাজে নিযুক্ত বা হোটেল, মেস ইত্যাদি স্থানে পরিচারিকার কাজে নিযুক্ত আছেন তাঁরাও এই আইনের আওতায় আসবেন। এই আইনে অপরপক্ষ বলতে বোঝাবে যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে মহিলা যৌন হয়রানির অভিযোগ এনেছেন তাকে। (ধারা ২ এম)

অভিযোগ জানাতে হবে, মালিক বা কর্মক্ষেত্রের আধিকারিকের কাছে। মালিক বা আধিকারিকের সংজ্ঞা হল, যে কোনও ধরনের প্রশাসন বিভাগ, সংস্থা, সংগঠন সমস্ত ধরনের সরকারি সেরকারি প্রতিষ্ঠানকে যিনি বা যাঁরা নিয়ন্ত্রণ করেন এবং যিনি কর্মচারীদের নিযুক্ত করেছেন। গৃহস্থালির কাজের ক্ষেত্রে যিনি ওই বাড়িতে মহিলাটিকে নিযুক্ত করেছেন বা যিনি তাঁর কাজের সুবিধা নিচ্ছেন তাঁকে বোঝাবে। এই আইনে কর্মক্ষেত্রের একটি বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। সরকারি বা বেসরকারি বা সরকারি আর্থিক সাহায্য প্রাপ্ত কোনও সংগঠন, যেকোনও শাখা অফিস, ট্রাস্ট, স্কুল, কলেজ, হসপিটাল, নার্সিংহোম, প্রকাশনা বিভাগ, খেলাধুলা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান যেখানে কোনও মহিলা কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত আছেন বা যেখানে তাঁকে কাজের জন্য যাতায়াত করতে হবে। (ধারা ২৩) কোনও মহিলা যৌন হেনস্থার শিকার হলে তিনি ওই অঞ্চলের থানাতেও অভিযোগ জানাতে পারবেন। এই আইনের ৪ নম্বর ধারাতে বলা হয়েছে প্রতিটি সংস্থাকে আভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটি গঠন করতে হবে। এই কমিটির প্রধান হবেন সংস্থার কোনও মহিলা কর্মী। এই কমিটির অর্ধেক সদস্যকে মহিলা হতে হবে। প্রত্যেক সদস্যের মেয়াদ থাকবে তিন বছর পর্যন্ত। অন্তত দু'জন কর্মী এই কমিটিতে থাকবেন যাঁরা আইন এবং সামাজিক কাজের ব্যাপারে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। এই কমিটিতে একজন সদস্য থাকবেন যিনি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সদস্য এবং নারীর অধিকার এবং যৌন হেনস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। এই আইনে অভিযোগ জানানোর সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এই আইনের ৯ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, যদি কোনও মহিলা অভিযোগ জানাতে চান তাহলে তিনি ঘটনার দিন থেকে তিন মাসের মধ্যে অভিযোগ জানাবেন। যদি একাধিকবার ঘটনাটি ঘটে তাহলে শেষবার ঘটনা ঘটার নিত মাসের মধ্যে অভিযোগ জানাতে হবে। যদি বিলম্ব ঘটে তাহলে বিলম্ব ঘটার সঠিক ও যুক্তিগ্রাহ্য কারণ প্রদর্শন করতে হবে। তাহলে পরেও অভিযোগ গ্রহণ করা হবে। অভিযোগের ভিত্তিতে কমিটি অপরপক্ষকে অভিযোগ সম্পর্কে জানাবে। সংস্থার নিয়ম মেনে বিষয়টির অনুসন্ধান করা হবে। যেকোনও অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান জিজ্ঞাসাবাদ ও কাগজপত্র পেশ করার জন্য কমিটি দশ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সাক্ষীদের ডেকে পাঠাতে পারেন। তদন্তের পর অভ্যন্তরীণ কমিটি নিয়োগকর্তার কাছে দশ দিনের মধ্যে রিপোর্ট পাঠিয়ে দেবে। অভিযোগ প্রমাণ হলে ওই সংস্থার পক্ষ থেকে শাস্তি হিসেবে অভিযুক্তের বদলি, ক্ষতিপূরণ এবং চাকরির নিয়ম অনুযায়ী শাস্তি হবে।

যৌন অপরাধ থেকে শিশুদের সুরক্ষা আইন, ২০১২

যৌন অপরাধ থেকে শিশুদের সুরক্ষা আইন ২০১২ অর্থাৎ কোন শিশুকে ২০১২ সালের আগে, ১৮ বছরের নীচে কোন ব্যক্তিকে যদি যৌন নির্যাতনের লক্ষ্যবস্তু হতে হতো তাহলে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার জন্য অন্য কোন বিশেষ আইন ছিল না। ভারতীয় দন্ডবিধি অর্থাৎ (ইন্ডিয়ান পেনাল কোড) অনুযায়ী বিচার চলতো যেখানে শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে বিশেষ কিছু ফারাক ছিল না। ২০১২ সালের পরে প্রোটেকশন অফ চিল্ড্রেন ফ্রম সেক্সুয়াল অফেন্সেস্ অ্যাক্ট, ২০১২ (যৌন অপরাধ থেকে শিশুদের সুরক্ষা আইন) চালু হবার পর, কোন শিশু যৌননির্যাতনের শিকার হলে নতুন আইন অনুসারে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হবে। এই আইনে নির্যাতিত শিশুদের বিশেষ সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং একই সাথে কঠোর করা হয়েছে যৌন নির্যাতনকারী ব্যক্তিদের সাজা।

নতুন আইন অনুসারে শিশুদের উপর যৌন অপরাধের বিভিন্ন স্তরভেদ করা হয়েছে। তবে সর্বপ্রথমে বলা উচিত যে এই আইনে ১৮ বছরের নীচে যে কোন ব্যক্তিকে শিশু হিসাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

ভারতীয় দন্ডবিধিতে নারীদের উপর বিভিন্ন রকমের যৌন নির্যাতনের সঙ্গে নতুন এই আইনের বেশ কিছু তফাৎ আছে। ভারতীয় দন্ডবিধিতে যৌন নির্যাতনের শিকার শুধুমাত্র নারী। কিন্তু শিশুদের এই আইনে অবশ্যই ছেলেমেয়ে ভেদাভেদ করা হয়নি।

প্রথমেই আসা যাক এই আইনে অপরাধের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে। এই আইনের ৩নং ধারাতে সংক্ষিপ্ত করে বলা হলে এই রকম দাঁড়ায় যে যদি কোন ব্যক্তি তার পুরুষাঙ্গ অথবা তার শরীরের অন্য কোন অংশ অথবা কোন বস্তু, কোন শিশুর যৌনাঙ্গে, পায়ুতে, মূত্রনালীতে যত সামান্য অংশই প্রবেশ করাক তাকে ভেদকারী যৌন নির্যাতন বলা হবে। (পেনিট্রেটিভ সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট) যদি কোন

ব্যক্তি তার মুখগহ্বর কোন শিশুর পুরুষাঙ্গ, যোনি, পায়ু, মূত্রনালীতে প্রয়োগ করে অথবা শিশুটিকে এইরকম করতে বাধ্য করে তাহলেও এই অপরাধের সংজ্ঞায় চলে আসবে। দোষ প্রমাণিত হলে অভিযুক্তের যাবজ্জীবন কারাদন্ড থেকে ৭ বছর পর্যন্ত সাজা হতে পারে। ভারতীয় দন্ডবিধিতে ধর্ষণের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তার সাথে এই সংজ্ঞার যথেষ্ট সাযুজ্য আছে।

উপরিউক্ত ঘটনা যদি কোন পুলিশ অফিসার এলাকাধীন স্থানে বা সেনাবাহিনীর সদস্য বা সরকারি কর্মচারী, জেল, হোম, শিশুদের আবাসন, সরকারী বা বেসরকারী হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির এলাকাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন স্থানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি যদি কোন শিশুর উপর ভেদকারী যৌন নির্যাতন করে তাহলে অপরাধকে তীব্র (অ্যাগ্রেভেটেড) ভেদকারী যৌন নির্যাতন বলা হয়। এই অপরাধের সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সেই সব ঘটনাও যেখানে একাধিক ব্যক্তি সংগঠিত করছে এই ধরণের যৌন নির্যাতন বা যদি শিশুর বয়স ১২ বছরেরও নীচে হয় বা কারো হেফাজতে থাকাকালীন তিনি এইরকম ঘটনা ঘটান বা শিশুটির শারীরিক, মানসিক প্রতিবন্ধকতার সুযোগ নিয়ে এই রকমের যৌন নির্যাতন করেন ইত্যাদি আরও বহুবিধ অবস্থায়।

এই আইনের ৭নং ধারায় বলা হয়েছে যে কোন ব্যক্তি যদি কোন শিশুর যোনি, লিঙ্গ, পায়ু বা স্তন স্পর্শ করে বা শিশুটিকে করতে বাধ্য করে বা যৌন নিপীড়নের উদ্দেশ্য নিয়ে দৈহিক সম্পর্ক করে কিন্তু তা ভেদকারী যৌন নির্যাতন না হয় তবে তাকে যৌন নির্যাতন (সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট) বলা হবে। এই অপরাধ করলে, অভিযুক্তের তিন থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাবাস হতে পারে। তীব্র যৌননির্যাতন (অ্যাগ্রেভেটেড সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট) করলে পাঁচ থেকে সাত বছর পর্যন্ত সাজাও হতে পারে।

এই আইনের ১১ নং ধারায় শিশুদের উপর যৌন হয়রানির সংজ্ঞা দেওয়া আছে। যদি কোন শিশুকে শব্দ, অঙ্গভঙ্গী অথবা কোন বস্তু বা দৈহিক অংশকে দেখিয়ে অথবা কোন শিশুকে তার দেহের কোন অংশকে অনাবৃত দেখানো অথবা কোন শিশুকে অশ্লীল ছবি বা বই প্রদর্শন করানো ইত্যাদি নানাবিধ কার্যক্রমকে যৌন হয়রানির সংজ্ঞায় রাখা হয়েছে। কোন ব্যক্তি এই অপরাধ করলে তার তিন বছর পর্যন্ত সাজা হতে পারে।

কোন শিশুকে পর্ণোগ্রাফিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় তাহলে প্রকারভেদে সাত বছর থেকে যাবজ্জীবন সাজা হতে পারে।

এই আইনে শিশুদেরকে বিভিন্ন রকমের আইনি হয়রানি থেকে নিষ্কৃতি দেওয়ার একটা প্রচেষ্টা রয়েছে। ২৪ নং ধারা অনুযায়ী পুলিশের কাছে নির্যাতিত শিশুটির বক্তব্য নেওয়া হবে কোন থানায় নয়, বরঞ্চ শিশুটির বাড়িতে যেখানে সে থাকে অথবা এমন কোন জায়গায় যা শিশুটি পছন্দ করে। যিনি পুলিশ অফিসার হবেন তিনি পুলিশের পোষাকে যাবেন না এবং যতদূর সম্ভব মহিলা পুলিশ অফিসার হওয়াই বাঞ্ছনীয়। শিশুটির সমস্ত পরিচয় গোপন রাখা হবে এবং অভিযুক্তর সাথে যেন শিশুটির কোনরকম মোলাকাত না হয় এরকম ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। শিশুটির বাবা মা অথবা শিশুটি ভরসা করতে পারে এমন কোন ব্যক্তির উপস্থিতিতে ম্যাজিস্ট্রেটের বা পুলিশের কাছে শিশুটির বয়ান নথিভুক্ত করতে হবে। শিশুটি যদি মেয়ে হয় তবে অবশ্যই তাকে কোন মহিলা চিকিৎসক দ্বারা ডাক্তারি পরীক্ষা করা হবে।

এই আইনের সমস্ত মামলায় শুনানী হবে বিশেষ আদালতে এবং বিশেষভাবে নিযুক্ত সরকারী আইনজীবীর পরিচালনায় (২৮ ও ৩২ নং ধারা) বিচারের সময় সরকারী আইনজীবি অভিযুক্তর আইনজীবী উভয়কেই প্রশ্ন করতে হবে আদালতের মাধ্যমে। আদালতের উপর দায়িত্ব থাকবে বিচারকক্ষ যেন শিশুর পক্ষে উপযুক্ত পরিবেশ পায় এবং শিশুর বাবা-মা অভিভাবক বা বন্ধুস্থানীয় বা আত্মীয়স্বজন এর উপস্থিতিতে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। একই সাথে বিশেষ আদালতে এটাও সুনিশ্চিত করতে হবে যেন শিশুটিকে বারবার আদালতে আসতে না হয় এবং বিচারের সময় শিশুটিকে একাধিকবার বিশ্রামের সুযোগ দিতে হবে। শিশুটিকে আক্রমণাত্মক বা চরিত্র হননকারী প্রশ্ন করা যাবে না। কোনমতেই শিশুটির পরিচয় যেন প্রকাশ না হয়ে পড়ে সে ব্যাপারেও আদালতকে দায়িত্ব নিতে হবে। প্রয়োজনে এই বিশেষ আদালত অভিযুক্তকে সাজা ছাড়াও শিশুটির মানসিক ও দৈহিক দুর্ভোগের জন্য তার উপর সরাসরি ক্ষতিপূরণের আদেশও দিতে পারেন।

এই আইনের ৩৫ নং ধারা অনুযায়ী, বিশেষ আদালতে অভিযোগ গ্রহণ করার একমাসের মধ্যে শিশুটির সাক্ষ্য নথিভুক্ত করতে হবে, দেরী হলে কারণ

দর্শাতে হবে। পুরো বিচার প্রক্রিয়া এক বছরের মধ্যে শেষ করতে হবে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমস্ত বিচার প্রক্রিয়াকে শেষ করতে হবে।

আরো কিছু বিশেষ প্রক্রিয়া আছে এই আইনে যেখানে শিশুটির সাক্ষীর সময়ে শিশুটি যেন অভিযুক্তের মুখোমুখি না হয় এবং এই ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ আদালত প্রয়োজনে ভিডিও-কনফারেন্স, আয়না অথবা পর্দা ব্যবহার করতে পারেন। এই মামলার বিচার খোলা আদালতে হবে না। গোপনে হবে অর্থাৎ ক্যামেরা ট্রায়াল হবে।

২৯ নং ধারা অনুসারে বলা হয়েছে যে কোন ব্যক্তি যদি শিশুর বিরুদ্ধে তীব্র ভেদকারী যৌন নির্যাতন বা ভেদকারী যৌন নির্যাতন অথবা তীব্র যৌন নির্যাতন বা যৌন নির্যাতন করে তবে আদালত বিচারের সময় ধরে নেবে যে অভিযুক্ত এই অপরাধ করেছে এবং অভিযুক্তকেই প্রমাণ করতে হবে যে সে নির্দোষ।

এই আইনটির সমস্ত দিক অনুধাবন করলে একটি ধারণা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে নির্যাতিত শিশুকে আর আগের মতো দুর্ভোগ বা হয়রানির শিকার হতে হবে না। তবে আইনটি নতুন। এর প্রয়োগ এখনো যথাযথ হয়ে ওঠেনি। এই আইনের সুবিধাগুলো কতটা নির্যাতিত শিশুর কাছে পৌঁছাবে তা নির্ভর করছে সঠিক প্রয়োগের ওপর। আমাদের দেশে বহু জনকল্যাণমূলক আইন থাকা সত্ত্বেও প্রকৃত অর্থে সাধারণ মানুষ এখনো ভুক্তভোগী। আশা করি, এই আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই অভিজ্ঞতার অন্যথা হবে।

অভিজিত দত্ত
আইনজীবী ও সমাজসেবী

তথ্যসূত্র ˙ প্রয়াস, মার্চ, ২০১৫ সংখ্যা।

হিন্দু দত্তক আইন (১৯৫৬) সম্পর্কিত কিছু তথ্য

১৯৫৬ সালের ২১শে ডিসেম্বরে হিন্দু দত্তক আইনটি বলবৎ হয়। এই আইনের আগে শুধু ছেলেদেরই দত্তক নেওয়া যেত, মেয়েদের নয়। এই আইনের বলে এখন মেয়েদেরও দত্তক নেওয়া সম্ভব। হিন্দু দত্তক আইন জম্মু ও কাশ্মীর ছাড়া ভারতবর্ষের অন্য সব প্রদেশেই প্রযোজ্য। হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ ও শিখ সব ধর্মাবলম্বীরাই এই আইনের আওতায় পড়ে। কিন্তু মুসলিম, খৃষ্টান, পার্সী ও ইহুদীদের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য হবে না।

দত্তক গ্রহণ বৈধ বলে বিবেচিত হবে নিচের সব শর্তাবলীগুলি মানা হলে :

- ❖ যে দত্তক নেবে, তার দত্তক নেবার আইনত ক্ষমতা বা যোগ্যতা আছে।
- ❖ যে দত্তক দেবে, তার সেরকম যোগ্যতা আছে।
- ❖ দত্তক নেওয়া হচ্ছে আইনসঙ্গতভাবে।

দত্তক গ্রহণ করার যোগ্যতা :

হিন্দু পুরুষের ক্ষেত্রে—যে কোনও সুস্থমস্তিষ্ক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ স্ত্রীর সম্মতি নিয়ে শিশুপুত্র বা শিশুকন্যাকে দত্তক নিতে পারে। স্ত্রীর সম্মতির প্রয়োজন হয় না, যদি তাঁর স্ত্রী কোর্টের বিচারে সুস্থমনা না হয় অথবা সংসার পরিত্যাগ করে যাকে অথবা হিন্দুত্ব বর্জন করে থাকে।

হিন্দু নারীর ক্ষেত্রে—একজন সুস্থমনা প্রাপ্তবয়স্কা হিন্দু নারী শিশুপুত্র বা শিশুকন্যাকে দত্তক নিতে পারে, যদি সে অবিবাহিতা হয় বা বিবাহ-বিচ্ছিন্না হয় অথবা বিধবা হয়। স্বামীর বর্তমানেও হিন্দু নারীর পক্ষে দত্তক নেওয়া সম্ভব, যদি তার স্বামী পরিত্যাগ করে থাকে, অথবা হিন্দুত্ব বর্জন করে থাকে, কিংবা কোর্টের চোখে অসুস্থমস্তিষ্ক বলে পরিগণিত হয়। যদি হিন্দুনারী বিবাহিতা হয়, তাহলে তাকে স্বামীর সম্মতি নিয়ে দত্তক নিতে হবে।

সূত্র : অবসর নেট

দত্তক দেবার অধিকার :

সন্তানকে দত্তক হিসেবে দেবার অধিকার শুধু পিতা বা মাতা বা অভিভাবকের আছে। পিতা সন্তানকে দত্তক হিসেবে দান করতে পারে মাতার সম্মতি নিয়ে। মাতা যদি সংসার ত্যাগ করে থাকে, অথবা হিন্দুত্ব বর্জন করে থাকে, কিংবা কোর্টের বিচারে অসুস্থ মস্তিষ্ক বলে পরিগণিত হয়, তাহলে তার সম্মতির কোনও প্রয়োজন নেই। বিধবা নারী তার সন্তানকে দত্তক দিতে পারে। বিবাহিতা নারীও তা পারে, যদি তার স্বামী সংসার ত্যাগ করে থাকে, অথবা হিন্দুত্ব বর্জন করে থাকে, কিংবা কোর্টের বিচারে অসুস্থমস্তিষ্ক বলে পরিগণিত হয়।

১৯৬২ সালের শিশু আইন (Children act, 1962) অনুসারে, যদি শিশুর মাতা ও পিতা দুজনের কেউই বেঁচে না থাকে বা সংসার ত্যাগ করে যাকে বা শিশুকে পরিত্যাগ করে, অথবা কোর্টের বিচারে মানসিকভাবে অসুস্থ অসুস্থ পরিগণিত হয়, বা শিশুর সঠিক পিতা মাতার পরিচয় অজ্ঞাত থাকে, তাহলে সেই শিশুর অভিভাবক সেই শিশুকে দত্তক হিসেবে দান করতে পারে—কোর্টের অনুমতি নিয়ে। কোর্ট এই অনুমতি দেবে শিশুর বয়স ও বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী তার ইচ্ছার কথা বিবেচনা করে এবং তার মঙ্গলের কথা চিন্তা করে। এই অনুমতি পেতে হলে কোর্টকে সন্তুষ্ট করতে হবে যে, দত্তক সংক্রান্ত ব্যাপারে বেআইনীভাবে পয়সার কোনও লেনদেন হচ্ছে না।

দত্তক হিসেবে কাউকে নেওয়া যাবে না :

- ❖ যদি সে হিন্দু না হয়।
- ❖ যদি সে ইতিপূর্বেই আর কারোর দত্তক হয়।
- ❖ যদি সে বিবাহিত হয় (ব্যতিক্রম যদি এ ব্যাপারে অন্য কোনও সামাজিক নিয়ম না থাকে)।
- ❖ যদি তার বয়স পনেরোর কম না হয় (ব্যতিক্রম যদি এ ব্যাপারে অন্য কোনও সামাজিক নিয়ম না থাকে)।

দত্তক সম্পর্কিত অন্যান্য আইন :

শিশুপুত্রকে দত্তক নেবার ক্ষেত্রে যে পিতা বা মাতা দত্তক নিচ্ছে, তাদের কোনও হিন্দু পুত্র, পৌত্র, বা প্রপৌত্র জীবিত থাকলে দত্তক গ্রহণ বৈধ হবে না।

শিশুকন্যাকে দত্তক নেবার ক্ষেত্রে যে পিতা বা মাতা দত্তক নিচ্ছে, তাদের কোনও হিন্দু কন্যা (পুত্রী), পৌত্রী বা প্রপৌত্রী জীবিত থাকলে দত্তক গ্রহণ বৈধ হবে না। একই শিশুকে একাধিক দম্পতি দত্তক নিতে পারবে না।

যখন কোন পুরুষ কন্যা সন্তান দত্তক নিচ্ছেন তখন তার বয়স দত্তক কন্যার থেকে অন্তত ২১ বছরের বেশী হতে হবে অনুরূপভাবে যখন কোন নারী পুত্র দত্তক নিচ্ছেন তখন তার বয়স দত্তক পুত্রের থেকে অন্তত ২১ বছরের বেশী হতে হবে।

দত্তক দেওয়া বা নেওয়ার উদ্দেশ্য হতে হবে জন্ম-পিতামাতার কাছ থেকে নিয়ে শিশুকে সরিয়ে নেওয়া।

(ভারতবর্ষে মুসলিম, খৃষ্টান, পার্সী ও ইহুদীদের জন্য দত্তক নেবার কোনও আলাদা আইন নেই। এরা অনাথ আশ্রম থেকে দত্তক নিতে পারে Gurdians and Wards Act অনুসারে কোর্টের অনুমতি নিয়ে।)

ভারতবর্ষে দত্তক নেবার অধিকার—কিছু তথ্য :

ভারকবর্ষে দত্তক এমাত্র হিন্দুরাই নিতে পারে। হিন্দু অ্যাডপ্শন এন্ড মেইন্টনেন্স অ্যাক্ট, ১৯৫৬ (Hindu Adoption and Maintenance Act of 1956) অনুযায়ী হিন্দুদের দত্তক নেবার অধিকার রয়েছে। ভারতবর্ষের মুসলমান, খ্রীশ্চান, পার্শি ও ইহুদী নাগরিকরা গার্জেন এন্ড ওয়ার্ডস অ্যাক্ট, ১৮৯০ (Guardians and Wards Act [GAWA] of 1890) অনুসারে অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর অভিভাবকত্ব পেতে পারেন, কিন্তু তাকে দত্তক সন্তান হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন না এবং এই অভিভাবকত্ব নিরঙ্কুশ নয়—বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তা নাকচ হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। শুধু তাই নয়, শিশুটি সাবালক অর্থাৎ তার বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হবার পর সেই অভিভাবকের সঙ্গে তার আইনগত কোনো সম্পর্ক আর থাকে না।

সূত্র : অবসর নেট

পারিবারিক আদালত আইন, ১৯৮৪

এই আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছে নারীদের সুবিধার্থে—তাদের পারিবারিক সমস্যার দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য। আজকের ভারতবর্ষে নারীদের আইনগত অনেক অধিকার থাকলেও, আইন সম্পর্কে বহু নারীর অজ্ঞতা, আর্থিক অসুবিধা ও যে কোনও মামলা নিষ্পত্তি হতে দীর্ঘকাল সময় লাগা ইত্যাদি প্রতিকূলতার জন্য নারীরা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে অনেক সময়েই বঞ্চিত থাকে। এইসব সমস্যার কথা ভেবেই পারিবারিক আদালত আইন (Family Courts Act, 1984) সৃষ্টি করা হয়েছে।

পারিবারিক কোর্টে কোনও উকিল আসতে পারে না (অর্থবলের ফলে এক পক্ষ দুর্ধর্ষ উকিল এনে যাতে মামলায় নিজের সুবিধা না করে নিতে পারে, বা যাতে আইনের মারপ্যাঁচে মামলা দীর্ঘস্থায়ী না করতে পারে—এগুলি বন্ধ করার উদ্দেশ্যে)। এই কোর্টে উকিলের বদলে থাকবে শুধু নিরপেক্ষ পরামর্শদাতা বা কাউন্সেলর (Counselor)। তারা বাদী-বিবাদী দুই পক্ষের কাছেই যাবে ও গিয়ে কথা বলবে; প্রয়োজন মতে তাদের বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়স্বজনদের প্রশ্ন করবে বিষয়টি ভালো করে বুঝবার জন্য। ব্যাপারটি নিজেরা পরিষ্কার বুঝে তারা দু-পক্ষকেই বোঝাবে ও বিচারকের কাছে তাদের রিপোর্ট পেশ করবে। মামলা যদি বিবাহবিষয়ক হয়, তাহলে প্রথমে বিচারকের চেষ্টা হবে ব্যাপারটা আপোসে মিটিয়ে ফেলা। সেটা সম্ভব না হলে, উভয়পক্ষ যদি রাজি হয়—তাহলে তাদের সম্মতি নিয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদের আদেশ দেওয়া। সম্পত্তি কিভাবে ভাগ হবে, ভরণপোষণের দায়িত্ব কার কি বর্তাবে, নাবালকের অভিভাবকত্ব কে পাবে—এইসব বিচারক স্থির করে দেবে।

সূত্র : অবসর নেট

পিতা-মাতা এবং বয়স্ক নাগরিকগণের ভরণপোষণ এবং কল্যাণমূলক আইন, ২০০৭

বাবা-মা ও বৃদ্ধদের দেখাশোনা নিয়ে সম্প্রতি ভারতবর্ষে একটি আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। যেসব বাবা-মা বৃদ্ধ, তাঁদের ভরণপোষণের ব্যাপারে সন্তান বা আত্মীয়দের কোনও সাহায্য পাচ্ছেন না, তাঁদের সুবিধার্থে এই আইনটি প্রণীত হয়েছে। নীচে এই আইনটির উপর কিছু তথ্য দেওয়া হল :

কোনও সিনিয়র সিটিজেন বা বৃদ্ধ নাগরিক যার মধ্যে পিতা-মাতাকেও ধরা হবে—যদি নিজেদের আয় বা সম্পত্তি থেকে নিজের ভরণপোষণ করতে অসমর্থ হন, তাহলে তাঁরা এই আইনের জন্য সৃষ্ট বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আবেদন জানাতে পারেন। (এখানে বৃদ্ধ নাগরিক বলতে বোঝাচ্ছে, যে ভারতীয় নাগরিকের বয়স ষাট বছরের বেশি; পিতা বা মাতা বলতে বোঝাচ্ছে আপন পিতা বা মাতা পালক পিতা বা মাতা, সৎ পিতা বা মাতা; ভরণপোষণ বলতে বোঝাচ্ছে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এবং চিকিৎসা ও চিকিৎসা সংক্রান্ত দেখভাল)।

সন্তান ও আত্মীয়ের দায়িত্ব বৃদ্ধ নাগরিকদের দেখভাল করা যাতে তাঁরা স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারেন।

- পিতা-মাতার ক্ষেত্রে তাঁদের এক বা একাধিক সাবালক সন্তানের দায়িত্ব হবে ভরণপোষণের। (এখানে সন্তান বলতে বোঝাচ্ছে সাবালক পুত্র, কন্যা, পৌত্র ও পৌত্রী)।

- নিঃসন্তান বৃদ্ধ নাগরিকের ক্ষেত্রে তাঁর কোনও আত্মীয়ের দায়িত্ব হবে ভরণপোষণের। (আত্মীয় বলতে বোঝাচ্ছে সন্তানহীন বৃদ্ধ নাগরিকের স্থাবর বা অস্থাবর, স্বোপার্জিত বা পারিবারিক সূত্রে অর্জিত, পরিমাপ্য (tangible) বা অপরিমাপ্য (intangible) সম্পত্তির আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারী।

সূত্র : অবসর নেট

এ বিষয়ে অন্যান্য তথ্য :

- বৃদ্ধ নাগরিকের যে কোনও আত্মীয় যার এই বৃদ্ধ নাগরিকের দেখভাল করার যথেষ্ট সম্পদ আছে কিংবা যে এই বৃদ্ধ নাগরিকের সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে পাবে তার ওপর এই দায়িত্ব বর্তাবে। যদি একাধিক আত্মীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়, তাহলে এদের ভরণপোষণের খরচা সম্পত্তি যেভাবে ভাগ হবে, তার সমানুপাতে বর্তাবে।
- ভরণপোষণের জন্য আবেদন করতে হবে বৃদ্ধ নাগরিক বা পিতামাতাকে অথবা সেই ব্যক্তি যদি অক্ষম হন, তাহলে অন্য কোনও ব্যক্তি বা তাঁর অনুমোদিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার দ্বারা। ক্ষেত্র বিশেষে ট্রাইব্যুনাল যাকে খুশি এই দায়িত্ব দিতে পারে। ভরণপোষণের অর্থের পরিমান নির্ধারিত হবার আগে ট্রাইব্যুনাল অন্তর্বর্তীকালীন ভরণপোষণের পরিমান নির্ধারণ করে দিতে পারে—যেটি সন্তানদের বা আত্মীয়কে বৃদ্ধ নাগরিক বা পিতামাতাকে দিতে হবে।
- আবেদনপত্র জমা পড়ার পর সন্তান বা আত্মীয়ের উপর নোটিস জারি করা হবে। বিচারের সময় তাদের বক্তব্য শোনা হবে এবং ভরণপোষণের পরিমাণ সম্পর্কিত সবকিছুর নিস্পত্তি করতে হবে। কোনও বিশেষ অবস্থায় ট্রাইব্যুনাল আবেদনপত্রটির মীমাংসার জন্য আরও ৩০ দিন অতিরিক্ত সময় ধার্য করতে পারে।
- যদি একাধিক ব্যক্তির ওপর ভরণপোষণের অর্থ দিতে বলা হয়, তাহলে তাদের একজনের মৃত্যু হলে অন্যের উপর দায়িত্বের পরিমাণ বাড়বে না।
- ভরণপোষণ দেবার হুকুম জারি হওয়া সত্ত্বেও যদি কোনও সন্তান বা আত্মীয় সেটা না মানে, তাহলে ট্রাইব্যুনাল তাদের বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট জারি করতে পারে। অনাদায়ে আর্থিক শাস্তি ছাড়াও এক মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডের আদেশও দিতে পারে।
- এই আইনে বিচারের স্থান হল যেখানে বৃদ্ধ নাগরিক থাকেন বা আগে পর্যন্ত ছিলেন অথবা যেখানে সন্তানরা বা আত্মীয় থাকে।

সূত্র : অবসর নেট

- ভরণপোষণের পরিমান নির্ধারণ করার জন্য সন্তান বা আত্মীয়দের বক্তব্য ট্রাইব্যুনাল শুনবে। যদি ট্রাইব্যুনাল মনে করে যে, ইচ্ছে করে সন্তান বা আত্মীয় ট্রাইব্যুনালের নোটিসে সাড়া দিচ্ছে না, তাহলে তাদের বক্তব্য না শুনেই ট্রাইব্যুন্যাল আদেশ জারি করতে পারেন। যেক্ষেত্রে সন্তান বা আত্মীয় বিদেশে বসবাস করে, সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে ট্রাইব্যুনাল সমন জারি করবেন। তবে নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করার সুযোগ দিতে ট্রাইব্যুনাল একজন সালিশী অফিসারকে (cosiliation officer) নিযুক্ত করতে পারেন।
- প্রত্যেকটি প্রদেশের দায়িত্ব প্রতিটি সাব-ডিভিশনে এক বা একাধিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করা। এটি এই আইন কার্যকরী হবার ছয়মাসের মধ্যে করার জন্য নির্দেশ এই আইনে রয়েছে। ট্রাইব্যুনালের সভাপতিত্ব করবেন অন্তত এস.ডি.ও পদধারী কোনও ব্যক্তি। ট্রাইব্যুনালকে সাক্ষ্যপ্রমাণ নেওয়া, সাক্ষীদের হাজির হবার পরওয়ানা ইত্যাদি জারি করার জন্য দেওয়ানী বিচারালয়ের ক্ষমতা দেওয়া হবে।
- ভরণপোষণের জন্য মাসিক অর্থ দেবার আদেশ জারি করার ক্ষমতা ট্রাইব্যুনালের থাকবে। এই অর্থের সর্বোচ্চ পরিমাণ প্রদেশ সরকার স্থির করে দেবে, কিন্তু সেটি কোনও ক্ষেত্রেই দশ হাজার টাকার বেশি হবে না।
- যদি কোনও বৃদ্ধ নাগরিক বা পিতা-মাতা ট্রাইব্যুনালের কাছে সন্তোষজনকে বিচার পাননি বলে মনে করেন, তাহলে ট্রাইব্যুনালের অর্ডার বের হওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে সুবিচারের জন্য তিনি অ্যাপেলেট ট্রাইব্যুনালের কাছে আবেদন করতে পারবেন। সাধারভাবে ট্রাইব্যুনাল বা অ্যাপলেট ট্রাইব্যুনালে উকিল নিয়ে যাওয়া যাবে না। প্রদেশ সরকার একজন ভরণপোষণ অফিসার নিয়োগ করবেন যার কাজ হবে পিতা-মাতা চাইলে ট্রাইব্যূনালের বিচারের সময়ে সাহায্য করা।
- প্রদেশ সরকারের দায়িত্ব হবে বিভিন্ন জায়গায় প্রয়োজনীয় বৃদ্ধাশ্রম প্রতিষ্ঠা করা। শুরুতে প্রতিটি জেলায় অন্ততঃ একটি বৃদ্ধাশ্রম প্রতিষ্ঠা

করতে হবে যেখানে ১৫০ জন বয়স্ক নাগরিক-যাদের জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সঙ্গতি নেই—তাদের থাকার জায়গা থাকে। তাদের জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ইত্যাদিরও বন্দোবস্ত রাখতে হবে। বৃদ্ধদের চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন বন্দোবস্তর কথাও এই আইনে রয়েছে।

- এই আইনে বলা হয়েছে যদি কোনও বৃদ্ধ নাগরিক কাউকে তাঁর সম্পত্তি দান করেন এই চুক্তিতে যে তাঁকে দেখভাল করার দায়িত্ব দান গ্রহণকারী নেবে; পরে সেই দায়িত্ব দান গ্রহণকারী পালন করতে অস্বীকৃত হলে ট্রাইব্যুনাল এই দানপত্রকে অসিদ্ধ বলে ঘোষণা করতে পারে—যদি বিবেচিত হয় এই দানপত্র লেখার পেছনে চাপ ও বঞ্চনা কাজ করেছিল।
- দেখভালের দায়িত্ব বর্জন করে যদি কেউ বৃদ্ধ নাগরিককে অত্যাচার করে, তাহলে তার তিনমাস পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা পাঁচ হাজার টাকার জরিমানা অথবা দুইই হতে পারে। তবে এটি জামিনযোগ্য অপরাধ বলে পরিগণিত হবে।

সূত্র : অবসর নেট

লোক আদালত কী এবং কেন?

প্রত্যেক রাজ্য প্রাধিকার অথবা জেলা প্রাধিকার অথবা সুপ্রিম কোর্ট আইনি পরিষেবা কমিটি অথবা হাইকোট আইনি পরিষেবা কমিটি অথবা তালুক আইনি পরিষেবা কমিটি তদীয় বিবেচনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ান্তরে এবং নির্দিষ্ট স্থানে লোক আদালত সংগঠিত করতে পারবেন।

একটি নির্দিষ্ট এলাকার জন্য গঠিত লোক আদালত কত জন কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত বিচার বিভাগীয় অফিসার ও অন্যান্য ব্যক্তিগণকে নিয়ে গঠিত হবে তা রাজ্য প্রাধিকার, জেলা প্রাধিকার বা সুপ্রিম কোর্ট আইনি পরিষেবা কমিটি বা হাইকোর্ট আইনি পরিষেবা কমিটি বা তালুক আইনি পরিষেবা কমিটি যাঁরা এই লোক আদালত বসাচ্ছেন তাঁদের দ্বারা স্থিরীকৃত হবে।

লোক আদালত কোন ক্ষেত্রে বিচারার্থে মামলা গ্রহণ করবেন?

আইনি পরিষেবা পাওয়ার যারা যোগ্য সেইসব ক্ষেত্রে—

(ক) মামলার উভয় পক্ষই যদি সম্মত হয়; অথবা

(খ) এক পক্ষ যদি মামলাটিকে লোক আদালতে মীমাংসার জন্য প্রেরণ করতে আদালতে দরখাস্ত করে এবং প্রাথমিকভাবে আদালত মনে করেন যে মীমাংসার সম্ভাবনা আছে; অথবা

(গ) আদালত যদি মনে করেন যে মামলাটি লোক আদালতে বিচারের উপযুক্ত তাহলে উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলিতে আদালত লোক আদালতে মামলাটি বিচারার্থ প্রেরণ করবেন।

লোক আদালত গঠনকারী কোনো প্রাধিকার বা কমিটি মামলার কোনো পক্ষের কাছ থেকে পাওয়া দরখাস্তের ভিত্তিতে যদি মনে করেন যে মামলাটির লোক আদালতে বিচার হওয়া উচিত তাহলে লোক আদালত ওই মামলার বিচার করতে পারবেন। কিন্তু অপর পক্ষের বক্তব্য শোনার যুক্তিযুক্ত সুযোগ না দিলে মামলাটিকে লোক আদালতে পাঠানো যাবে না।

লোক আদালত ন্যায়, সমদর্শিতা, স্বচ্ছতা এবং অন্যান্য আইনি নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়ে যত দ্রুত সম্ভব মামলার পক্ষগুলির মধ্যে আপোশরফা বা একটা ফয়সালায় পৌঁছাবার চেষ্টা করবেন।

লোক আদালত কোনো মামলার রায় না দিয়ে মামলার পক্ষভুক্তদের আদালতে যাওয়ার পরামর্শ দিতে পারেন।

লোক আদালতে কোনো মামলা প্রেরিত হলে আদালতে যে কোর্ট ফি জমা নেওয়া হয়েছিল তা ফেরত দেওয়া হবে।

লোক আদালতের কোনো রায় দেওয়ানি আদালতের অথবা অন্য কোনো উপযুক্ত আদালতের আদেশের সমতুল্য এবং বিবাদের সকল পক্ষের উপরই বাধ্যতামূলকভাবে প্রযোজ্য। এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা যায় না।

স্থায়ী লোক আদালত গঠিত হতে পারে। লোক আদালতের মাধ্যমে বিনা ব্যয়ে বিরোধের মীমাংসা ও দ্রুত সমাধানে পৌঁছানো সম্ভব বলে সমাজের দুর্বলতর শ্রেণি বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত কল্যাণকর আইনি পরিষেবা।

মহিলা কমিশন

ভারতের সংবিধান ও অন্যান্য আইন প্রদত্ত মহিলাদের অধিকারগুলি সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরে মহিলা কমিশন গঠনের জন্য আইন প্রণীত হয়েছে। এই আইনগুলিতে মহিলাদের জন্য ব্যবস্থিত অধিকার সম্পর্কিত বিশেষ অংশগুলির আলোচনা করা হল।

জাতীয় মহিলা কমিশন অ্যাক্ট, ১৯৯০

কেন্দ্রীয় সরকার শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য একটি জাতীয় কমিশন আইন ১৯৯০ সালে প্রণয়ন করেছেন। জম্মু ও কাশ্মীর ব্যতীত ভারতের সর্বত্র এই আইন প্রযোজ্য।

জাতীয় মহিলা কমিশন নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হবে—

১. কেন্দ্রীয় সরকার মনোনীত একজন চেয়ার পার্সন, যিনি নারী প্রগতির কাজে আত্মনিয়োজিত।

২. আইন, ট্রেড ইউনিয়ন, শিল্প পরিচালনা বা মহিলাদের বিভিন্ন কর্মে নিযুক্তির যোগ্যতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ দায়বদ্ধ ব্যক্তি, মহিলাদের স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান (মহিলা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী সহ), প্রশাসন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা অথবা সমাজ কল্যাণে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, কর্মক্ষম, সৎ প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে কেন্দ্রীয় সরকার মনোনীত পাঁচজন সদস্য যাদের মধ্যে অন্তত একজন করে সদস্য তফশিলভুক্ত উপজাতি ও জনজাতির অন্তর্ভুক্ত।

৩. পরিচালনা, ম্যানেজমেন্ট বা সাংগঠনিক কাঠামোগত ক্ষমতা অথবা সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে পারদর্শী কোনো ব্যক্তি, অথবা কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিসের বা সর্বভারতীয় সিভিল সার্ভিসের একজন সদস্য যাঁর উপযুক্ত অভিজ্ঞতা আছে এমন ব্যক্তি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সদস্য সচিব হিসাবে নির্বাচিত হবেন।

কমিশনের প্রধান কার্যাবলি

(ক) সংবিধান ও অন্যান্য আইনে মহিলাদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে রক্ষাকবচগুলির বিষয়ে অনুসন্ধান ও তদন্ত করা;

(খ) বাৎসরিক অথবা নির্ধারিত সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে উক্ত রক্ষাকবচগুলি কার্যকরীভাবে সম্পাদিত করার জন্য সুপারিশ করা;

(গ) এই রিপোর্টে কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার কর্তৃক মহিলাদের অবস্থার উন্নতির জন্য রক্ষাকবচগুলি কার্যকরীভাবে সম্পাদিত করার জন্য সুপারিশ করা;

(ঘ) উপযুক্ত সময়ান্তরে মহিলা সম্পর্কিত সংবিধান ও অন্যান্য আইনের বর্তমান ব্যবস্থাগুলির পর্যালোচনা এবং এই সব আইনের ফাঁক, অসম্পূর্ণতা বা ত্রুটিগুলি সংশোধনের জন্য সুপারিশ করা;

(ঙ) সংবিধান ও অন্যান্য আইনের মহিলা সম্পর্কিত বিভিন্ন ব্যবস্থা লঙ্ঘনের ঘটনাগুলি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নজরে আনা;

(চ) নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে অভিযোগের ভিত্তিতে অথবা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে খতিয়ে দেখা :

[i] মহিলারা অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে;

[ii] মহিলাদের সুরক্ষা এবং সমানাধিকার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীত আইনগুলি সঠিকভাবে সম্পাদিত না হলে;

[iii] মহিলাদের কষ্ট লাঘব করা, তাদের কল্যাণসাধন এবং বাধাগুলি দূর করার জন্য যেসকল নিয়মনীতি, পরিচালন পদ্ধতি ও অন্যান্য নির্দেশ আছে সেগুলি অমান্য করা হলে;

এবং এইসকল ক্ষেত্রে অমান্য করা হলে সেই বিষয়গুলি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের গোচরে আনা;

(ছ) মহিলাদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক বা নৃশংস নির্যাতনের ফলে উদ্ভূত বিশেষ সমস্যাগুলি সম্পর্কে বিশেষ সমীক্ষা ও অনুসন্ধানের জন্য উৎসাহ দেওয়া এবং সেগুলির অপনোদনের নির্দিষ্ট বাধাগুলি চিহ্নিত করা;

(জ) সর্বক্ষেত্রে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করা, তাদের অগ্রগতি রোধ করার ক্ষেত্রে যে কারণগুলি দায়ী যেমন আবাসন ও অত্যাবশ্যক পরিষেবাগুলি না পাওয়া, একঘেয়ে নীর সকাজ ও

পেশাগত স্বাস্থ্য-ঝুঁকি কমানোর জন্য এবং কাজের ক্ষেত্রের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য অপ্রতুল সহায়ক পরিষেবা ব্যবস্থা ও প্রযুক্তি—সেই কারণগুলি চিহ্নিত করা;

(ঝ) মহিলাদের সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ ও পরামর্শ নেওয়া;

(ঞ) কেন্দ্র ও রাজ্য মহিলাদের উন্নয়নের অগ্রগতির মূল্যায়ন;

(ট) জেল বা পরিত্যক্ত মেয়েদের হোম, মহিলাদের হাজত বা অন্য কোনো জায়গা যেখানে মহিলাদের বন্দি হিসাবে অথবা অন্য কোনোভাবে অভিরক্ষাধীনে রাখা হয় সেগুলি পরিদর্শন করা বা পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা এবং সেগুলি ত্রুটিমুক্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরে আনা;

(ঠ) বহু সংখ্যক মহিলার পক্ষে ক্ষতিকারক এমন বিষয়সমূহকে জড়িত করে যে মামলা, সেই মামলার ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা প্রদান;

(ড) মহিলাদের সম্পর্কিত যেকোনো বিষয়ে, বিশেষ করে তারা যে বিভিন্ন ধরনের অসুবিধায় ভোগে সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট সময় অন্তর সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ;

অন্য যেকোনো বিষয় জাতীয় মহিলা কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাতে পারেন।

উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে তদন্ত করার সময়ে কমিশন কাউকে ডেকে পাঠানো বা জোর করে হাজির করা, কোনো নথি উপস্থাপন করা, সাক্ষ্য ও হলফনামা গ্রহণ করা, কোনো কোর্ট বা অফিস থেকে কোনো রেকর্ড তলব করা ইত্যাদি বিষয়ে একটি দেওয়ানি আদালতের মতোই ক্ষমতা ভোগ করবে।

এই কমিশনের সমস্ত রিপোর্ট এবং এ সম্পর্কে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে অথবা নেওয়ার কথা ভাবা হয়েছে এবং যদি কমিশনের সুপারিশ অগ্রাহ্য করা হয়ে থাকে তবে তার কারণ কী সে সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার সংসদে বক্তব্য পেশ করবেন।

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন আইন, ১৯৯২

ভারতের সকল অঙ্গরাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গই সর্বপ্রথম রাজ্যস্তরে মহিলা কমিশন আইন, ১৯৯২ প্রণয়ন করে। পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের গঠন—

নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন গঠিত :

১. রাজ্য সরকার মনোনীত একজন চেয়ার পার্সন ও একজন ভাইস চেয়ার পার্সন;

২. যেসব ব্যক্তি মহিলাদের স্বার্থরক্ষায় যোগ্যতাসম্পন্ন এবং সৎ, যাঁদের আইন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে, অথবা মহিলাদের অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা আছে, অথবা কোনো ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্বে আছেন অথবা মহিলাদের সার্বিক স্বার্থসুরক্ষা এবং উন্নতিবর্ধনের জন্য গঠিত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে আছেন এমন ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে রাজ্য সরকার নিয়োজিত নয়জন সদস্য থাকবেন, তাঁদের মধ্যে অবশ্যই একজন তফশিলভুক্ত জাতি ও একজন জনজাতির সদস্য থাকবেন।

রাজ্য সরকারের একজন অফিসার সদস্য সচিব হিসাবে কাজ করবেন।

রাজ্য কমিশন প্রয়োজন বোধ করলে তার সভাগুলিতে জাতীয় মহিলা কমিশনের প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানাতে পারবেন।

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের কার্যাবলি

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের কার্যাবলি মোটামুটিভাবে জাতীয় মহিলা কমিশনের কার্যাবলীর অনুরূপ।

কমিশন রাজ্য সরকারের কাছে ছয় মাস অন্তর অথবা অন্য কোনো স্থিরীকৃত সময়ে সুপারিশসহ নিজ কার্যাবলির রিপোর্ট পেশ করবেন এবং রাজ্য সরকার যত শীঘ্র সম্ভব ওই রিপোর্ট এবং সে-সম্পর্কে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং যেক্ষেত্রে সুপারিশ অগ্রাহ্য করা হয়েছে তার কারণ কী এসবই রাজ্যের আইনসভায় পেশ করবেন।

রাজ্য সরকারও মহিলা সম্পর্কিত কোনো নীতি প্রণয়নের সময়ে কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারেন।

কোনো বিষয়ে জাতীয় মহিলা কমিশনের কোনো রিপোর্ট সম্পর্কে রাজ্য সরকার উদ্বিগ্ন থাকলে অথবা রাজ্য সরকার আলোচ্য বিষয়ে জড়িত থাকলে এবং রাজ্য সরকার চাইলে ওই বিষয়ে তাদের মতামত ও সুপারিশ জানানো রাজ্য মহিলা কমিশনের দায়িত্ব।

মহিলাদের অধিকার রক্ষায় জাতীয় ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন যোগ্যতা সহকারে কাজ করে চলেছে।